বাতায়ন

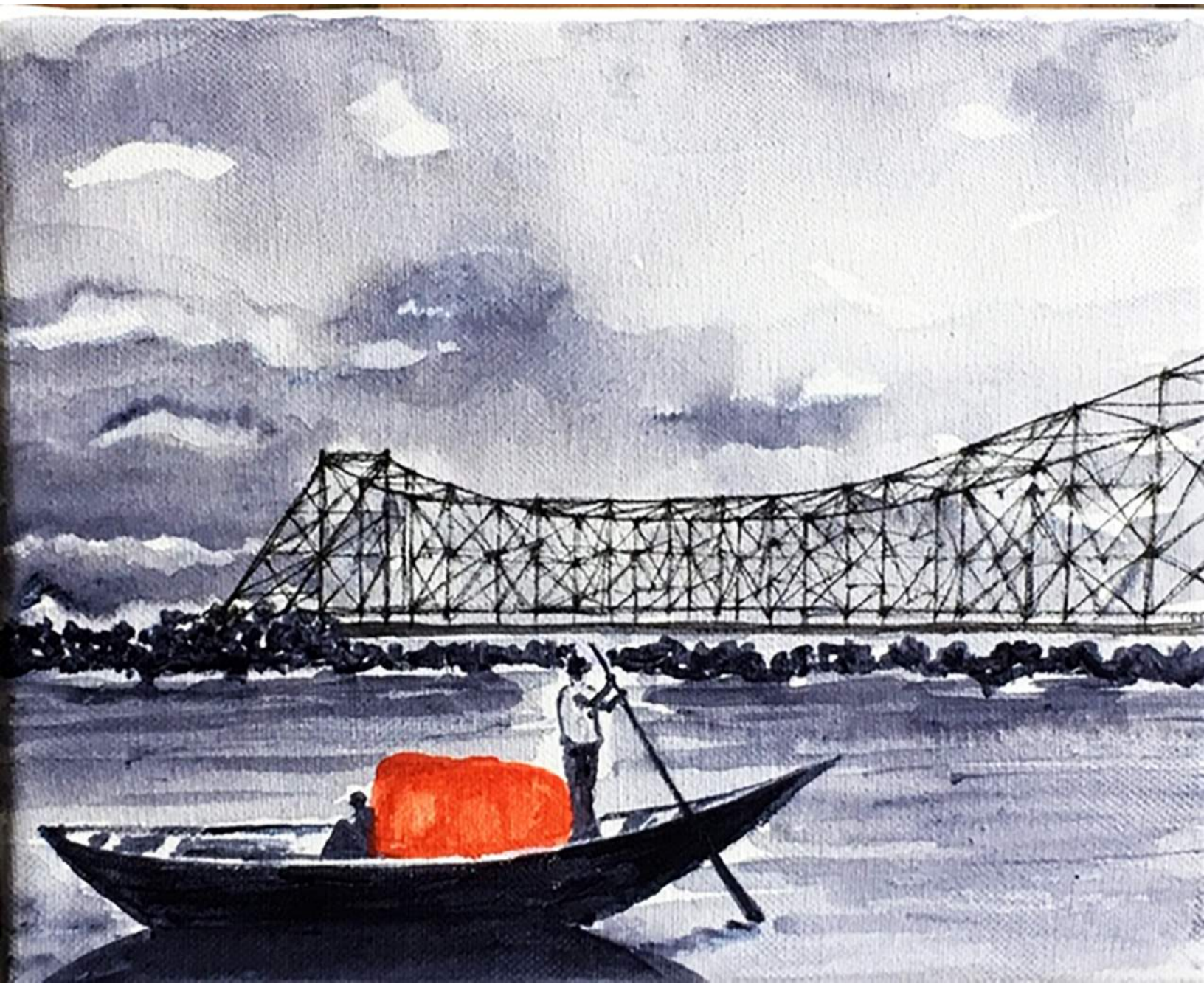

কাগজের নৌকা

BOOKS
NOT
BOMBS

বাতায়ন

কাগজের নৌকা

১৭তম সংখ্যা, অক্টোবর ২০২১

সম্পাদনা

সঞ্জয় চক্রবর্তী

Issue Number 17 : October 2021

Editor
Sanjoy Chakraborty
Sydney

Group Editor
Ranjita Chattopadhyay
Chicago

Sub Editors (Volunteer)
Sugandha Pramanik
Melbourne

Design and Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata

Website Design and Support
Susanta Nandi, Kolkata

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Concept & Production
Anusri Banerjee

Photo & Artwork Credit

Partha Pratim Ghosh **Painting : Front Cover**

As a Civil Engineering Graduate from Bengal Engineering College, Shibpur and a Professional Engineer (PE) of Pennsylvania, USA. I practiced Engineering for 52 years in USA, Canada and in India. Moved back to Kolkata from USA in 1987. Pursuing Painting as a hobby very passionately and with dedication. Organizing exhibition of my artwork every year in January, since 2014.

Ranjita Chattopadhyay **Inside Front Cover**

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায় – শিকাগোর বাসিন্দা । পেশায় শিক্ষিকা । আর নেশায় পড়ুয়া । বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই লেখাপড়া করার অভ্যাস আপাতত । রঞ্জিতা বাতায়নের গোষ্ঠী সম্পাদিকা । গত কয়েক বছর ধরে আমেরিকার বিভিন্ন 'লিটল ম্যাগাজিনে' ওনার লেখা বের হচ্ছে । শিকাগোর স্থানীয় সাহিত্যগোষ্ঠী উন্মেষের সঙ্গে উনি প্রায় এক দশক ধরে যুক্ত । সহলেখিকা হিসেবে রঞ্জিতার দুটি বই এযাবৎ প্রকাশিত হয়েছে – ''Bugging Cancer'' আর ''Three Daughters Three Journeys'' । সাহিত্যের হাত ধরে ভৌগোলিক সীমানার বেড়া ভাঙায় বিশেষ আস্থা রঞ্জিতার ।

Mousumi Roy **বেনারসে গঙ্গার ঘাট : Title Page**

মৌসুমী রায় – সেবায় ও পালনে, শুশ্রূষা ও পরিচর্যায় ব্যস্ত গৃহবধূ। যৎসামান্য অবকাশের আকাশে রামধনুর খোঁজ, কবিতা লেখায়, সাহিত্য পাঠে। পাঠকের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। উপরি পাওনা প্রাঞ্জল গদ্য আর কিছু নয়নাভিরাম ছবি।

Subramaniam Bhatt, Perth, WA **Inside Back Cover**

Subramaniam Bhatt is a professional Hindu priest and enthusiastic photographer.

Banksia (Grevillea) - Native Bush Plant of Western Australia. Photo taken during bush walk around the Swan River.

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত । প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ । রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

আজ থেকে মাসখানেক পরের তারিখ, ২৪শে অক্টোবর, সাল ১৯৯৮, ক্যাপ্টেন গুইয়ান মার্চ তার অপ্রতিরোধ্য জাহাজ "ফ্যান্টম" হন্ডুরাসের ওমোয়া বন্দর থেকে রওনা দিয়েছিলেন ছয় দিনের সফরে। মেক্সিকো উপসাগরের ঝড় "হ্যারিকেন মিচ" তখন ঘনীভূত হচ্ছিলো। ফ্যান্টম'কে পরে আর আর পাওয়া যায়নি, ঝড়ের ঘূর্ণাবর্তে সে হারিয়ে যায়।

আজকের মহামারীতে কোথাও যেন আগেকার অর্জিত বড় সড় চাওয়া পাওয়া গুলো হারিয়ে যাচ্ছে, গুলিয়ে যাচ্ছে অবলীলায়। আর থেকে যাচ্ছে জীবনের ছোট্ট ছোট্ট প্রাপ্তি গুলো। সেই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম প্রাপ্তির ঢেউ ভেঙ্গে কাগজের নৌকা অতিমারীর ঝড়'কে সামলিয়ে এসে নোঙর বাঁধলো পাঠকের মনের বন্দরে।

কবি শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন –

"... কঠিন মাটির ছোঁয়া পেয়েছি এই সমস্ত দিন –

নীচে কি তার একটুও নয় ভিজে ?

ছড়িয়ে দেব দু-হাতে তার প্রাণাঞ্জলি বসুন্ধরা,

যেটুকু পাই প্রাণের দিশা নিজে। ..."

সেই প্রাণের দিশা খুঁজে খুঁজে দেশ বিদেশের লেখক লেখিকারা সাজিয়েছেন সপ্তদশ কাগজের নৌকার সম্ভার। আশা রাখবো পাঠকের কাছে সমাদৃত হবে।

আজকের অস্থির সময়ে অবলীলায় কত কিছুই হারিয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগেই আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ। চলে গেলেন ঋজু'দা, রুরু, পৃথু'রা। মাধুকরীর পৃথু বোসের মতো আমরাও শাঁওন ও ভাদো নদীর রাতমোহনার দিকে তাকিয়ে ছিলাম এই ক'দিন। অপেক্ষার অবসানে কাগজের নৌকা এসে পৌঁছলো।

বুদ্ধদেব গুহ তাঁর "সম" উপন্যাসের প্রেক্ষিতে সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন "সব মেয়েই আমার কাছে প্রিয়, মঞ্জিমা ও সানাই দুজনেই",সামনেই দেবীপক্ষ, "মাতৃরূপেণ সংস্থিতা", দুর্গা তো আপামর বাঙালিরর মেয়েই ?

সবাই ভালো থাকবেন, এইটুকু কামনা করি।

সঞ্জয় চক্রবর্তী
সিডনি

সবিনয় নিবেদন

আশির দশকের প্রথম ভাগ। বাংলা কিশোরসাহিত্যের দাদারা তখন নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বাংলা শাসন করছেন । আসর জাঁকিয়ে রয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের "ঘনাদা", নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের "টেনিদা", এবং কিছুদিন আগে আবির্ভাব হয়েছে সত্যজিতের "ফেলুদা"র। আনন্দমেলা পাক্ষিক ম্যাগাজিনে একটি উপন্যাস পড়লাম, নাম "রুআহা"। আফ্রিকার পটভূমি তে লেখা উপন্যাস, সেখানে প্রথম পরিচয় হল আরেকজন নতুন দাদার সঙ্গে, নাম তাঁর ঋজুদা। একদা শিকারি ও পরে অরণ্যপ্রেমিক এই নায়ক কোথাও গিয়ে যেন "চাঁদের পাহাড়" এর শঙ্করের উত্তরসুরি।

পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব গুহের সাহিত্যের দরজা খুলে যেতেই একে একে পরিচয় "কোয়েলের কাছে", "চাপরাশ", "অভিলাষ", "কোজাগর" "মাধুকরী", "চানঘরে গান" ইত্যাদি অসংখ্যা সৃষ্টির সঙ্গে যা আমার মতন বহু ভ্রমণপিপাসী পাঠকের তৃষ্ণা মিটিয়েছিল । সেভাবে দেখতে গেলে বিভূতিভূষণের "আরণ্যক" পড়বার অনেক আগে তিনিই আমাদের প্রজন্মকে জঙ্গলকে চিনতে শেখান । "জঙ্গল"ই প্রধান চরিত্র তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে আর কাছ থেকে দেখা বহু অর্থবান , ধনহীন, উচ্চশিক্ষিত, তথাকথিত অশিক্ষিত, ভালো, মন্দ নানা মানুষের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে প্রকৃতিকে পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করে। অরণ্যের পটভূমিকায় গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে মানব-মানবীর সম্পর্কের রসায়ন। তাঁর সাহিত্যে অতুলনীয় প্রকৃতির বর্ণনা কোথাও যেন তাঁকে বিভূতিভূষণের যোগ্য উত্তরসূরি করেছে। লেখকের নিজের ভাষায় "বিভূতিভূষণ প্রকৃতিকে দেবীরূপে পুজো করেছেন। আর আমি তাকে প্রেমিকা রূপে রমণ করেছি।"

এখন "জঙ্গলমহল" শব্দটি হেডলাইন হয়ে বারবার উঠে আসে সংবাদে। বুদ্ধদেব গুহই প্রথম "জঙ্গলমহল" শব্দটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়েছিলেন। তাঁর হাত ধরেই ম্যাকলাস্কিগঞ্জ, বাংরিপোসি, পালামৌ প্রথম চেনা আমাদের (পরে আরেকটু বড় হয়ে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পালামৌ জাতীয় লেখা পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল)। পরবর্তীকালে বহুবার কর্মসূত্রে বাংলা, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও উড়িষ্যার বিভিন্ন জঙ্গলে ফিরে ফিরে গিয়ে খুঁজে বেড়িয়েছি তাঁর সাহিত্যের ঘ্রাণ ।

অনেক পাঠক বুদ্ধদেবকে চেনেন শিকার কাহিনি বা অরণ্যপ্রেমিক লেখক হিসেবে। কিন্তু শিকার বা অরণ্যকে ছাপিয়ে তাঁর লিখন ধরে রয়েছে এক বিশেষ সত্তাকে, যার নাম "প্রেমিক"। যা কিছু নিষিদ্ধ, যা কিছু বাঙালি কুণ্ঠাভরে উচ্চারণ করত, সেই সবকিছুকে চিনিয়েছিলেন তিনি তাঁর বলিষ্ঠ কলমের মাধ্যমে। সেই প্রাক ইন্টারনেট, প্রাক উদারীকরণের যুগে তিনিই শিখিয়েছিলেন ভালবাসা আর শরীর জঙ্গলের মতোই আদিম নিয়ম মেনে চলে।

আবার বাংলা সাহিত্যে শুধুমাত্র পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে রচনা করা যেতে পারে "চানঘরে গান" এবং "সবিনয় নিবেদন" এর মতন উপন্যাস, যা শুধুমাত্র আঙ্গিকগত নতুনত্বের জন্যে বাংলা ভাষার একটি বিশিষ্ট কীর্তিচিহ্ন হিসাবে মান্যতা পাবে, এটাও সাম্প্রতিক কালের লেখকদের মধ্যে একমাত্র তিনিই করবার স্পর্ধা দেখিয়েছেন। "এপিস্টোলারি" বা পত্রসাহিত্য যে অন্যান্য ধারার মতন সাহিত্যের একটা ফর্ম, যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের পর তিনি ছাড়া সমসাময়িক আর কাউকে কাজ করতে দেখলাম না ।

ঠিক-বেঠিক সময় বিচার করবে , কিন্তু একমাত্র তিনিই স্পর্ধা দেখিয়েছিলেন বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে বিচ্ছেদ করতে, বিখ্যাত চলচিত্র পরিচালকের সাথে তর্কালাপে জড়িয়ে পড়ে বাংলা সাহিত্যের গুণগত মান নিয়ে সওয়াল করতে।

তাঁর জীবনে সহধর্মিণী ঋতু গুহের প্রভাব অনস্বীকার্য, তাঁদের প্রেম পর্বও ঘটনাবহুল যার বর্ণনা "হলুদ বসন্ত" উপন্যাসে আছে। একাধারে প্রথম সারির চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, শিকারী, আকাশবানীর অডিশন বোর্ডে ছিলেন, ছবি এঁকেছেন, ছড়া লিখেছেন, অসাধারণ টপ্পা গান গেয়েছেন। সাধে কি অন্নদাশঙ্কর তাঁকে বলেছিলেন "সব্যসাচী"। আসলে বুদ্ধদেব ছিলেন সেই বিরল প্রজাতির বঙ্গপ্রজন্মের শেষ কয়েকজনের প্রতিনিধি, যাঁরা ছিলেন ভারসাটাইল জিনিয়াস। আজকালকার ক্ষমতার চাটুকারিতা করা মধ্যমেধার বুদ্ধিজীবীদের জগতে হয়তো কিছুটা বেমানান ।

সবশেষে কি অদ্ভুত সমাপতন, বাঙালি কৈশোর প্রজন্মকে ভালবাসতে শেখানো, রোম্যান্টিকতার পাঠ পড়ানো মানুষটি চলে যাওয়ার জন্য বেছে নিলেন এমন একজনের জন্মদিনটিকে, যিনি পরকীয়াকে অমরত্ব দিয়ে গেছেন ... – সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে অর্থাৎ জন্মাষ্টমীতে চলে যাবেন বুদ্ধদেব গুহ, এটাই তো স্বাভাবিক ।

কবি সুবোধ সরকার যথার্থই বলেছেন "লেখক চলে যান না, তাঁর রোদ্দুর সরে যায় এক সময়। কিন্তু তাঁর ছায়া বারান্দায় বসে থাকে।"

বিদায় বুদ্ধদেব গুহ 🙏 ... অগণিত পাঠকের মনে থেকে যাবেন কৈশোর এবং যৌবনের স্মৃতির অংশ হয়ে ।

©সৌমিক বসু
৪ঠা সেপ্টেম্বর , সিডনী, অস্ট্রেলিয়া

সূচীপত্র

ধারাবাহিক

শ্যামলী আচার্য	**সুখপাখি**	11
সৌমিত্র চক্রবর্তী	**সময়**	22
শকুন্তলা চৌধুরী	**পরবাসী**	28
প্রতীপ কুমার ভট্টাচার্য	**পুরোনো দিনের কথা**	40
মমতা দাস (ভট্টাচার্য)	**আব্দুল চাচার লড়াই**	58
প্রশান্ত চ্যাটার্জী	**সংরুর – পাতিয়ালা N.I.S. training – যুদ্ধ পরবর্তী প্রথম ছুটি – বাড়ির কথা**	74
পারিজাত ব্যানার্জী	**সাত সুরের "প্র"-লয়**	79
	অষ্টম বিপত্তি	80
	নবরত্ন বাহার	81

কবিতা

উদ্দালক ভরদ্বাজ	**প্রেম**	7
মানস ঘোষ	**তোমায় বলিনি**	8
শঙ্খ ভৌমিক	**পাগল কন্যার প্রেম-গাঁথা**	8
সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায়	**ইশক্ ...**	9
শ্রাবনী রায় আকিলা	**এই রাত ...**	9
অমর্ত্য দত্ত	**নতশির**	10

গল্প

শাশ্বতী বসু	**কঙ্কণ**	43
রজত ভট্টাচার্য্য	**গোলকিপার**	48

উদ্দালক ভরদ্বাজ

প্রেম

কামনার গল্প, ঘুরে ঘুরে
আর কত দিন?
বমি আর রক্ত, বুক, মন ছিঁড়ে
আর কত দিন?

আমি সেই ধূসরতার কবি
আমার বুকের পাশে তোমার স্তনের নম্রতা
মানায় না

আমি সেই অখিল ক্ষুধার কবি
আমার তৃষ্ণার পাশে তোমার স্নিগ্ধতা
মানায় না

আমি সেই অন্ধ রসাতল
যেখানে প্রশমন নেই, বিরাম নেই অক্লান্ত বুভুক্ষার...
যার পূজা, মুগ্ধতার অর্পণে
এনে দেবে বলে, সঙ্কল্প করে অনুরক্ত প্রেম,
সকল ইচ্ছার মান, রেখে নেয়
শিরোধার্য করে, অকল্প ভালবাসা,
তাকে এই ক্লান্ত পথে
নামাতে পারব না আমি!

হে সুন্দর,
তুমি সেই অনন্ত কবিতা,
অলখ স্বপ্নের স্বরে, রূপময় প্রেমিকের ঘরে
তোমার স্নিগ্ধতা পূর্ণতা পাক...

আমার অক্ষমতা থাক আমার অক্ষর ঘিরে
আমার সুষুপ্তি যাক, অতলের অন্ধকার ভেঙে
আমার একান্ত সর্বনাশের পথে।
তুমি থেকো আলোক বর্তিকা হয়ে
জীবনের পথে, মানুষের সাথে,
সাথী হয়ে অনন্ত যৌবনের।

আমি যাই শিথিল সুপ্ততায়
আমি যাই অপ্রারগ নগ্নতায় ফিরে।

এম ডি এন্ডারসন ক্যান্সার সেন্টার-এ গবেষণায় রত **উদ্দালক** অবসরে কবিতা পড়া, লেখা এবং অনুবাদ নিয়ে থাকতে ভালবাসেন। উদ্দালকের কবিতা এবং অনুবাদ, কলকাতা এবং আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকা যেমন প্রবাসবন্ধু, দুকূল, বাতায়ন, সংবাদ-বিচিত্রা, স্বজন, প্রথম আলো, ভাষাবন্ধন, অর্কিড, ম্যাজিক-ল্যাম্প, স্বপ্নরাগ ইত্যাদিতে ছাপা হয়েছে। বঙ্গীয় মৈত্রী সমিতি দ্বারা প্রকাশিত বাংলার বাইরে বসবাসকারী লেখকদের কবিতা সংগ্রহ "কবিতা পরবাসে" এবং আন্তর্জাতিক বিজয়ওয়াড়া সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং অমরাবতী দ্বারা প্রকাশিত আন্তর্জাতিক, বহুভাষী কবিতাসংগ্রহ, Poetic Prism-এও স্থান পেয়েছে উদ্দালকের কবিতা। কবিতার বিষয় মূলত প্রেম হলেও, জীবনের আরও নানান উপলব্ধির প্রতিক্রিয়ায়ও উদ্দালক প্রকাশ করে রাখেন তার অনুভব। কখনো তা কবিতা হয়, কখনো শুধুই স্বগতোক্তি। সম্প্রতি নিউ জার্সির আনন্দ মন্দির প্রদত্ত গায়ত্রী স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তার সাহিত্যকর্মের উৎকর্ষতার জন্যে। স্ত্রী নীতি ও পুত্র সায়ন-কে নিয়ে উদ্দালক টেক্সাসের হিউস্টন শহরে থাকেন।

মানস ঘোষ

তোমায় বলিনি

সেই মহার্ঘ্য সন্ধ্যায়
তোমাকে না দেখলে
জানতেই পারতাম না যে,
একটাও ডানা নেই তোমার ...
আর চলার সময়,
পা পড়ে মাটিতে..
আমার হৃৎ স্পন্দনের মতোই,
নির্ভুল দূরত্বে।

জানতেও পারতাম না
তোমার মাথার পেছনে নেই
কোনো বলয় ...

করতল থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে না
কোনো অলৌকিক আলো ...
এমনকি স্বপ্নও নাকি খুব সাধারণ হয়
... আর সাদাকালো।

তোমায় বলিনি, –
কী যে খুশি হয়েছিলাম সেদিন !

মানস ঘোষ — মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা করার পর, বেছে নেন, সমস্ত আবেগ, ভাবালুতা আর ব্যক্তিগত পরিসরকে তছনছ করে দেওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ এক পেশা, ভারতীয় রেলের ''ট্রেনচালক'' । এই গ্রহে উনিই প্রথম ট্রেনচালক যার একটি বাংলা কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে । জীবিকা যাপন ও প্যাশনের এই পাহাড়প্রমাণ বৈপরীত্যের যন্ত্রণা কখনো তাঁকে স্তব্ধ করেছে, কখনো আবার আলোকিত বর্ণমালা নিয়ে হাজির হয়েছেন খোলা 'বাতায়ন' পাশে, আমাদের মাঝে।

শঙ্খ ভৌমিক

পাগল কন্যার প্রেম-গাঁথা

(Sylvia Plath এর Mad Girl's Love Song এর ভাবানুবাদ)

চোখ বুজলেই মৃত এই বসুধরা
পাতা তুললেই নবজন্মের ধারা
(তুমি তবুও রয়ে যাবে অধরা)

তারারা নেচেছে রঙের নতুন গভীরে
অবাধ অন্ধকার আবার এসেছে তীরে
চোখ বুজলেই মৃত এই বসুধরা

স্বপ্নে তুমি করলে পাগলপারা
ঠোঁটে আঁকলে স্বচ্ছ জোৎস্নাধারা
(তুমি তবুও রয়ে যাবে অধরা)

ফিরবে বলে সময়ের পথ চেয়ে
মুছে ফেলি কত জন্মের পরিচয়
(তুমি তবুও রয়ে যাবে অধরা)

তার চেয়ে কোকিল ভালবাসলে
বসন্তগান হত অজস্র ধারা
চোখ বুজলেই মৃত এই বসুধরা
(তুমি তবুও রয়ে যাবে অধরা)

শঙ্খ ভৌমিক – পেশায় অধ্যাপক; নেশায় নাট্যছাত্র ও সাহিত্যপ্রেমী। অভিবাসী জীবনের টুকরো যাপন নিয়ে কখনো নাটক, কখনো ছোট গল্প লেখা।

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায়

ইশক্ ...

বোঝনি
নিঃশর্ত সমর্পণ

অথচ শায়েরীর আলফাজে
আরোপিত ছিল না কিছুই
আনন্দস্পর্শঘন মুহূর্ত বড় ক্ষণিকের
জানি, একদিন সরে যাবে কুহেলীরহস্য
খুলে যাবে ব্যথারকাহন
হয়ত বুঝবে অমৃতসমান ফুটে
আছে শরণাগতের সুফিয়ানা আলাপন

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায় – উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএড ও মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনার শেষে কিছুদিনের শিক্ষকতা-জীবন। তারপরেই প্রবাসে পাড়ি। গত বাইশ বছর যাবৎ ঠিকানা নিউ জার্সি। পেশায় মন্তেসরি শিক্ষিকা। ২০০৮ সাল থেকে ছদ্মনামে ব্লগলেখা শুরু। ২০১০ থেকে বিভিন্ন দেশ ও বিদেশের পত্রপত্রিকা ও শারদীয়াতে নিজের নামে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লেখা চলতে থাকে, কমিউনিটির বিভিন্ন ভলেন্টারি কাজের পাশাপাশি নাটক ও সঞ্চালনা করে সময় কাটাতে ভালবাসেন।

শ্রাবনী রায় আকিলা

এই রাত ...

মেঘ ও চাঁদ মাখামাখি, ঠুমরি গানের মতো
অলস একটা রাত ! একটা অদৃশ্য পিয়ানো
বারান্দা পেরিয়ে সুর ছড়ায় সামনের সাদা ফুলের গাছ পর্যন্ত,
ঘরের ভেতর মাতাল হাওয়া দামাল পর্দাকে
উন্মত্ত ট্যাংগো নাচ শেখায় !

ঠিক এমন সময় শাওয়ারের ঠান্ডা জল,
চন্দন গন্ধের ট্যালকম পাওডার মন অবশ করে দিলে
রাত পাহারার বাঁশি বেজে ওঠে !
সব খান খান করে বলে যায়... “সাবধান !”

শ্রাবনী রায় আকিলা – পড়তে, লিখতে, বলতে, শুনতে, জানতে, দেখতে, ভাবতে ভালোবাসেন। এখনও পর্যন্ত্য লিখেছেন আনন্দবাজার, এই সময়, দুকূল, বর্তমান এবং উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায়। নিজের একটি ব্লগও আছে। তবে সবথেকে বেশি স্বস্তি বোধ করেন নিজের ফেসবুক ওয়ালে নিয়মিত, স্বাধীন ও ইচ্ছামত লিখতে।

অমর্ত্য দত্ত

নতশির

এত পথ সুখ পেরিয়ে কেন এই আঁধারে এলে ?
এখনও তোমার আঁচল থেকে ঝরছে আলোকণা ।
হাত দিও না এই শরীরে । হাত দিও না । থামো ।
ছড়িয়ে যাবে । জড়িয়ে যাবে অনিবার যন্ত্রণা ।

যেখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছো এইটা কাঁটার বাগান,
আর দু'কদম এগিয়ে এলে বিষণ্নতার কুটির ।
পা রেখো না চৌকাঠে তার । যেওনা অন্দরে ।
যাও ফিরে যাও আলোর পথে । ফিরে যাও লক্ষ্মীটি ।

এত বারণ, এত নিষেধ শুনলে না তো তুমি ।
সেই আমায় ছুঁলে কৌতূহলে । পা রাখলে ঘরে ।
জানালা খুলে তাকিয়ে দ্যাখো, অপার মরুভূমি ।
তাকিয়ে দ্যাখো সুখেরা কেমন মিশছে বালুঝড়ে ।

এখনও তুমি ভয় পাওনি ? এখনও তুমি দৃঢ় ?
এখনও তোমার চোখের কোণে স্বপ্ন-ঝিকিমিকি ?
এমন ভাবে মাখিয়ে দিলে কে আর বলো ফেরায়,
ওষ্ঠে জড়াও আধেক আমায় অধরে জড়াও বাকি ...

এ কেমন ছোঁয়া ! চতুর্দিকে জ্বলে উঠলো আলো ।
মারণব্যধি সারিয়ে দিলো আমার পৃথিবীর ।
গুল-এ-গুলজার কাঁটার বাগান । কোথায় মরুভূমি ?
এমন পাওয়ার সামনে আমি আমৃত্যু নতশির ...

অমর্ত্য দত্ত – জন্ম-১৯৮৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর মধ্য কলিকাতার একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে । শৈশব থেকেই বাংলা কবিতার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ও ভালোবাসা ছিল । পরবর্তী সময় স্কুল ম্যাগাজিনে কবিতা লেখার মধ্যে দিয়ে এই জগতে প্রবেশ । গত কয়েক বছর ধরে বিবিধ লিটিল ম্যাগাজিনের সঙ্গে যুক্ত ও নিয়মিত লেখেন । পেশা : কলিকাতার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত । নেশা : কবিতা ও কবিতা সম্বন্ধীয় সব কিছু.... দ্রষ্টব্য : ২০২০ সালে কবিতায় এ'পার ও'পার ৬ সংকলন-এ, কেয়াপাতা শারদ সংখ্যা ১৪২৭, কবিতাকুটির প্রকাশিত বিভিন্ন সংখ্যায় ও নানাবিধ ই-ম্যাগাজিন কবিতা প্রকাশ পেয়েছে ।

শ্যামলী আচার্য

সুখপাখি

(৭)

নবদ্বীপের বামনা, হালায় পইতাখান ফালাইয়া দিসে। হ্যার নরকেও ঠাঁই হইব না।

শহরে কান পাতলেই এখন এই এক আলোচনা। চণ্ডীমণ্ডপ থেকে নদীর ঘাট, কীর্তনের আসর থেকে পুকুরঘাট সরগরম। হিন্দুধর্মের ধারক ও বাহকেরা গেল গেল রব তুলেছেন। কলকাতার নব্য সমাজের আঁচে এবার এখানকার পোলাপানেরাও গোল্লায় না যায়।

সমস্যা অভিনব। বরিশাল জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে এসেছেন রামতনু লাহিড়ি। পৈতে ছিঁড়ে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় তাঁকে নিয়ে শহরে গ্রামে হই হই বহুদিন ধরেই। কৃষ্ণনগরের উচ্চ কুলীন ব্রাহ্মণ বংশে তাঁর জন্ম। বাবা রামকৃষ্ণ লাহিড়ী ছিলেন কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির সামান্য কর্মচারী। কিন্তু তাঁর গলায় ছিল দু'গাছা পৈতে। একটি সুতোর, অন্যটি হরিণের চামড়ার। এহেন বাপের ব্যাটা হয়েও মাথায় নড়ল পোকা। ওই যে ডিরোজিও সায়েবের ছাত্র বলে কথা। হিন্দু কলেজে দু'চারপাতা ইংরেজি পড়ে আর এরা এখন বাপ-মা, সমাজ-সংস্কার, ঠাকুরদেবতাকে অগ্রাহ্য করে। পৈতেখানা খুলে নৌকার ছইয়ে ঝুলিয়ে চলে যায়! একি অসৈরণ কাণ্ড! একে বেম্মজ্ঞানী, তায় পৈতে ছেড়েছেন সর্বসমক্ষে। জাতধর্ম সব রসাতলে গেল বলে। ছিছিক্কার পড়ে গেছে সর্বত্র। জেলা স্কুলের ছাত্রদের বাড়ির লোকেদের মধ্যে রীতিমতো চাঞ্চল্য। বেম্মজ্ঞানীদের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলাই এখন বেশি জরুরি। এরা কেরেস্তানের চেয়েও মারাত্মক। হেয়া কামখান ঠিক হয় নাই। হ্যার কাসে পোলাপানেরা কী শিক্ষা পাইব? অভিভাবকদের আপত্তিতে ছাত্ররা অনেকেই স্কুলে অনুপস্থিত থাকে। কিন্তু রামতনু তাঁর অপূর্ব সুন্দরকান্তি দেহসৌষ্ঠব আর বিনীত ব্যবহারে প্রথমেই মন জয় করে নিলেন তাঁর সহকর্মীদের।

সুন্দর মুখ আর সুন্দর ব্যবহার, মানুষের মন জয় করার মোক্ষম দুটি হাতিয়ার রামতনুর ঈশ্বরপ্রদত্ত। সেই সঙ্গে অগাধ পাণ্ডিত্যের জোরে হিন্দুধর্ম আশ্রিত নাগরিক সমাজে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে গেল বহুগুণ। খুব দ্রুত ধন্য ধন্য পড়ে গেল তাঁকে নিয়ে। ছাত্রদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন দ্রুত।

প্রিয় ছাত্র রাখালচন্দ্রকে একদিন ডেকে পাঠালেন রামতনু।

"আমার নামে অনেক কিছুই তোমরা শুনেছ বোধহয়। সবটা হয়ত বুঝতে পারোনি। আজ কিছু বলব বলে তোমায় ডেকেছি"।

রামতনু দীর্ঘদিন কলকাতার জলহাওয়ায় মানুষ। বাঙাল টান প্রায় নেই বললেই চলে। পরিশীলিত মার্জিত উচ্চারণ। ব্রাহ্ম হওয়ার অপরাধে বরিশাল শহরে আসার পরেও ধোপা-নাপিত বন্ধ ছিল তাঁর। ঝি-চাকর পাননি। স্বহস্তে সব কাজ করতেন। রাখাল স্কুলের ঘরে তাঁর টেবিলের সামনে সসংকোচে দাঁড়িয়ে থাকে। ওরা দেখেছে, হেডমাস্টারমশাই রাশভারী হলেও স্কুলের ক্লাসের শেষে খেলার মাঠে গিয়ে দাঁড়ান রোজ। খেলায় আর শরীরচর্চায় তাঁর ভীষণ উৎসাহ। কখনও কখনও ছাত্রদের মনে হয়েছে, হেডমাস্টারের তকমা না থাকলে তিনি নিজে ধুতি গুটিয়ে যে কোনও সময় স্বচ্ছন্দে নেমে পড়তে পারেন খেলার মাঠে। ক্লাসের বাইরে সবসময় ঘোরাফেরা। সব ছাত্রের নাম মুখস্থ। কে কবে আসেনি, কার বাড়িতে কী হয়েছে, সব তাঁর নখদর্পণে। ছাত্ররা কেউ দোষ করলে শাস্তি দেন না। বুঝিয়ে বলেন। কিন্তু সেই বোঝানোতে নীতিকথা বা জ্ঞান কম, আদর আর স্নেহের পরিমাণই বেশি। আবার ক্লাসরুমে পড়াতে পড়াতে রামতনু অন্য জগতের মানুষ। বইয়ের

পাতার বাইরেও যে মানুষের কত জ্ঞান থাকতে পারে ... রামতনুবাবুর কাছে যে না পড়েছে, সে ভাবতেই পারবে না। একদিন ইতিহাসের ক্লাসে মুসলমান শাসনকাল পড়াতে পড়াতে কী অবলীলায় বুঝিয়ে দিলেন হিন্দুকুশ আরাকান পর্বত হিমালয়ের বিস্তৃতি। ইতিহাস ভূগোল কখন একাকার হয়ে গেল। ছাত্ররা মুগ্ধ হয়ে শুনল, দেশ জাতি মাটি আর মানুষের আবহমান কালের অভিযোজন আর পরিবর্তনের কথা। কখন কোথায় মিলেমিশে গেল ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায়। ঘোরের মতো কেটে যায় এক-একটা ক্লাস।

"জানো রাখাল, টিকি নামাবলীর রক্ষণশীল সমাজ সারাজীবন আমাকে একঘরে করেই রাখল। তুমি শুনেছ কিনা জানিনা, তোমার অবশ্য শোনার কথাও নয়, ছেলেবেলায় হেয়ার সাহেবের পালকির পিছনে খুব দৌড়তাম। জানতাম, ওই সাহেবের ইস্কুলে ভালো পড়া হয়। ইংরেজি পড়া যায়। তখন আর কত বয়স আমার, এগারো-বারো হবে। ওনার চোখে পড়লে তবে না ওনার ইশকুলে ভর্তি হতে পারব! সায়েব কী বুঝেছিলেন কে জানে, আমাকে হেয়ার স্কুলে ভর্তি করে নিলেন। আমিও মন দিয়ে পড়লাম। ভালো ফল করলাম। জলপানি পেলাম। ওই জলপানি না পেলে পিতাঠাকুর আমাকে এতদূর পড়াতেন কিনা সন্দেহ।"

রাখাল অবাক হয়ে তাকায়। সামান্য পড়াশোনার জন্য ওই বয়সেই এত আগ্রহ?

"বুঝলে বাবা, ডিরোজিও সাহেবের চ্যালা আমি। শুধু মাস্টারমশাই ভাবিনি তাঁকে, তিনি আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতেন। আমিও তাই চেষ্টা করেছি বরাবর। কৃষ্ণনগর কালেজে পড়াতে গিয়ে দেখেছি পাঠ্যপুস্তকের বড় অভাব। এখন এখানেও দেখি তাই। চারদিকে রসদের বড় ঘাটতি। সব ঘাটতি যদি এই জীবনে মেটাতে পারতাম!"

দীর্ঘশ্বাস ফেলেন রামতনু। রাখাল চুপ করে থাকে। মাস্টারমশায়ের কথার মাঝখানে কথা বলা বা প্রশ্ন করা অভব্যতা। সেই শিক্ষা তারা পায়নি।

রামতনু লাহিড়ী পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান এই উজ্জ্বল মেধাবী ছাত্রটির দিকে। দীর্ঘ শিক্ষকজীবন অতিক্রম করে তিনি সম্যক বুঝেছেন, লাখুটিয়ার রাজচন্দ্র রায়ের এই পুত্রটির মধ্যে আগুন আছে।

বরিশাল থেকে পাঁচ মাইল উত্তরে লাখুটিয়া। মোগল সম্রাটের এক প্রধান কর্মচারী ছিলেন রূপচন্দ্র। শোনা যায়, তিনিই রায়চৌধুরী উপাধি পেয়েছিলেন। রূপচন্দ্রের নাতিকে দিল্লির সম্রাট কয়েক খণ্ড "লাখেরাজ" জমি দান করেন। সেইখান থেকেই লাখুটিয়ার রায়চৌধুরী পরিবারের নামকরণ। জজ আদালতের উকিল রাজচন্দ্র রায় এই বাড়ির কৃতী সন্তান। কাঁচা ভদ্রাসনটি তিনি নতুন করে তৈরি করেছিলেন ইঁট দিয়ে। লাখুটিয়া থেকে বরিশাল পর্যন্ত একটি রাস্তা বানিয়ে আর একটি খাল কেটে এই যাতায়াতের পথ সুগম করে দিয়েছেন। নিষ্ঠাবান হিন্দু পরোপকারী রাজচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাখালচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করেন রামতনু।

"দেশ জেগে উঠেছে রাখাল। তোমাদের মতো ছাত্র, তোমাদের মতো মানুষদের বড় দরকার বাবা। কিছু কাজ আছে। একে একে করতে হবে। তুমি পাশে থাকবে?"

"আপনে এ কি কন মাস্টারমশয়? আপনে যা কইবেন, আমি করনের লিগ্যা খাড়ায়্যা আসি। শুধু হুকুম করেন।"

"তবে শোনো। ঢাকা নর্মাল স্কুলের পাঁচজন ছাত্র এখন এই শহরে এসেছেন। স্কুলের পাঠ তাঁদের শেষ। নন্দ, হরিশ, গোপী, বৈদ্যনাথ আর ললিতমোহন। এরা ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষা পেয়েছেন ব্রজসুন্দর মিত্রের কাছে। বরিশাল শহরে এবার ব্রহ্মের উপাসনা শুরু করতে চাই। এই পচে গলে যাওয়া হিঁদুয়ানি থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে রাখাল। সমাজকে পরিচ্ছন্ন করতে হবে। তবে না সংস্কার। এরা উপাসনার জন্য একটি ঘরের সন্ধানে আছেন। তুমি কি এঁদের কোনওভাবে সাহায্য করতে পারো?"

রাখাল চেয়ে দেখেন রামতনু একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন তাঁর ছাত্রের চোখের দিকে। তাঁর দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ প্রত্যয়।

"আমারে আপনে একটু সময় দেন। লাখুটিয়ায় আমার পিতাঠাকুর জানতে পারলে অনর্থ ঘটব। এই হানে আমাগো বাসায় আগে নিরিবিলি ঘরের ব্যবস্থা করবার লাগবে। আপনের কথা আমার স্মরণে থাকবে মাস্টারমশয়।"

বনমালী শুনেছেন, তাঁর জন্মের আগেই রামতনু লাহিড়ি বদলি হয়ে যান বরিশাল জেলা স্কুল থেকে। এর মধ্যেই জড়ো হচ্ছেন নন্দকুমার সেন, হরিশচন্দ্র মজুমদার, গোপীনাথ রায়, বৈদ্যনাথ রায় আর ললিতমোহন সেন। রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁর নিজের গৃহের একটি প্রকোষ্ঠ নির্দিষ্ট করে দিলেন ব্রহ্ম-উপাসনার জন্য। সবার চোখের আড়ালে প্রতি সপ্তাহে একদিন বসত এই প্রার্থনাসভা। কিছুদিনের মধ্যেই এই উপাসনায় এসে যোগ দিলেন অন্নদাচরণ বর্মা।

রাখালচন্দ্র ক্রমশ ঝুঁকে পড়ছেন ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ আর নীতির দিকে। হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠছে মন। সংস্কারের নামে অনাচারের ক্লেদ স্পর্শ করছে অশিক্ষিত সমাজকে। এই জড়ভরত সমাজকে মুক্তি দিতে পারে শুধু ব্রাহ্মধর্মের পবিত্র আলো।

গোপন আসর গোপন রইল না বেশিদিন। লাখুটিয়ায় রাজচন্দ্র রায়ের কাছে খবর পৌঁছল তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাখালচন্দ্র রায় বরিশালে তাঁর নিজের বাসায় গোপন প্রার্থনাসভা শুরু করেছেন। শুধু তাই নয়। দ্বিতীয় পুত্র বিহারীলাল খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা নিতে উদ্যোগী। রাখাল তাঁর অন্তঃপুরিকাদের কাছে জ্ঞানের আলো পৌঁছে দেবার একটু চেষ্টা করছিলেন, সেখানেও বাধা পড়ল।

"হ্যার ওই হক্কল উচাটনপানা ব্যাবাক বন্ধ করা লাগব। আইজ থিক্যা ওই বাসায় হকলের ঢোকন বন্ধ। পাচিত্তির কইরা অগো ধম্মে ফিরাও।" বৃদ্ধ পিতার আদেশ অমান্য করে কার সাধ্য! রাখাল এবং বিহারী গোঁড়া হিঁদুর মতো মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য হলেন।

সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেল প্রতি বুধবারের ব্রহ্ম-উপাসনা।

সব আলো নেভে না। কিছু কিছু বাতি জ্বলে টিম টিম করে। রাখালচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে নদীর তীরে, গাছের ছায়ায় উপাসনা করেন তরুণ ছ'টি সমাজহিতৈষী। স্কুল বিভাগের ডেপুটি ইন্সপেক্টর শ্যামাপদ বসুর চোখে পড়ে যায়, এই উদ্যোগী যুবকেরা জড়ো হয়েছেন এক গাছের তলায়। চোখেমুখে কী এক অপার্থিব প্রশান্তির ছায়া।

এঁদের তিনি ডেকে নিলেন নিজের আবাসে।

(৮)

হিন্দুধর্মের বাইরে তখনও পৃথক ব্রাহ্ম ধর্ম নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। বরিশাল শহরে ব্রহ্ম-উপাসনায় অনুসরণ করা হত চিতপুর-জোড়াসাঁকোর প্রিন্স টেগোরের ব্যাটা দেবেন ঠাকুরের উপাসনা-পদ্ধতি। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বরিশালে যোগ দিয়েই খুঁজে নিলেন সমমনস্ক সমাজসংস্কারকদের।

ইমন ঝড়ের গতিতে নোট নিয়েছে। দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস। একের পর এক নাম তার নোটবুকে।

"মণি, এঁদের কারও বাড়িঘর নিশ্চই আর এখন সংরক্ষিত নেই।"

"নাই এমন কথা কইতে পারি না বউঠান। আসে। তার চরিত্র ব্যাবাক পাল্টায়া গ্যাসে। কিসু বাড়ি ভাঙা পড়সে। কিসু হাতবদল হইসে। হাতবদল মানে তো বোজেন। সেই বাড়ি আর আগের মতো নাই। আপনি খুঁইজ্যা সেইখানে যাইতেই

পারেন। মনখারাপ হইব। তার চাইতে কাইল কাকভোরে চলেন কীর্তনখোলার ধারে যাই। তারপর সদর গার্লসের সেই চত্বর। আপনে তো বহু কিসু দ্যাখবেন শুনলাম...।"

ইমন আনমনা হয়ে যায়। দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ছিলেন বিদ্যাসাগর মশাইয়ের অনুজ। আর তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় হুগলির ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জামাতা। এঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া অষ্টাদশ শতকের বরিশাল শহরে ব্রাহ্মসমাজের কাজ এগোতেই পারত না। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তারাপ্রসাদবাবু তাঁর নিজের ঘরে ডেকে নিলেন এই নবীন ধর্মপিপাসুদের। এখানে তারা ধর্মালোচনা করবে। প্রাণের আরাম। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা আলোচনা আর সমাজে গোপন রইল না। বরং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার জোরালো জায়গা তৈরি হল। লাখুটিয়ার জমিদারপুত্র রাখালচন্দ্র আবার তাঁর বাবার নির্দেশ অমান্য করে ফিরে এলেন ব্রাহ্মসমাজে। এবার আচার্যের আসনে বসলেন হরিশচন্দ্র মজুমদার।

তারাপ্রসাদ পেশায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁকে অমান্য করা দুঃসাধ্য। ক্ষমতাবান মানুষকে কখনওই কেউ ঘাঁটায় না। শুধু তা'ই নয় সমাজসংস্কারে তাঁর সদিচ্ছা নিয়েও অন্তত কারও মনে কোনও প্রশ্নচিহ্ন ছিল না।

"জানো মণি, আমি অবাক হয়েছি, কলকাতায় যখন সমাজসংস্কারের হাওয়া জোরদার, রামমোহনের পরে দেবেন ঠাকুর কেশব সেন হাল ধরেছেন, ঠিক সেই সময় বরিশাল শহরও জেগে উঠছে তার পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। আমার অদ্ভুত লেগেছে। কী আশ্চর্য সমাপতন। কলকাতা থেকে ভৌগোলিক অবস্থানে অত দূরে থেকেও বরিশাল একই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছে। কোথায় যেন পড়ছিলাম, এক খ্রিষ্টান নাগরিকের বাড়িতে সেই সময় সামাজিক ভোজের আয়োজন হচ্ছে। দল বেঁধে অনেকেই আসছেন...।"

"তা'গো বয়কটও করসে সক্কলে। ল্যাখে নাই আপনের ইতিহাসে? হিঁদুয়ানি আবার কবে কারে বুক পাইত্যা আপন করল কয়েন দেহি।"

ইমন তাকিয়ে দেখে, মণিরুদ্দিনের চোখে আগুন নেই। জল। যে জলকে তারা বলে পানি। কিন্তু তার রঙ নেই, তার নোনা স্বাদে ফারাক নেই, তার উপচে পড়া আকুলতায় ফাঁকি নেই।

"তুমি ঠিকই বলেছ মণি। হিন্দুসমাজের নেতারা মেনে নিতে পারলেন কোথায়? তারা একে বললেন অনাচার। বিরাট আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। নানান গণ্ডগোল। যেমন হয় ... যারা সেদিন ওই সামাজিক ভোজে বসে পাত পেড়ে খেয়েছিলেন, তাদের ধোপা-নাপিত বন্ধ হল। জাত গেল আর কি ... "

"জাত আর জাত। ক্যামন একখান শব্দ। ঘিন্না লাগে ... ছ্যাপ ফ্যালাই এই জাতধম্মের নামে ... অ্যাকখান দ্যাশ টুকরা হইয়া গেল, তবু শান্তি নাই। মাইনষের এত চিন্তা আয় কমনে ? বাঁইচ্যা থাকতে লাগে তো মাথার উপর একখান ছাউনি আর প্যাটের ভাত। লাজলজ্জার কাপড়চোপড়ের কথা ছাইড়্যাই দিলাম। মাজেমইদ্যে মনে হয়, সেই আদিমযুগের বনেজঙ্গলেই য্যান আছিলাম ভালো ... সব ফুরাইলে লাগে তো সাড়ে তিন হাত জমি। সে আপনে গোরই দেন আর চিতায় চড়ান, ফারাক কীসের ?"

ইমনের কষ্ট হয়। এইসব আলোচনায় ওর যেন কেমন অপরাধবোধ চেপে বসে। ও এসেছে অন্য দেশ থেকে। ঘরের পাশে পড়শি দেশ। জল মাটি হাওয়াতে বিভেদ নেই। বিচ্ছিন্নতা শুধু গোলটেবিলে। এমনটাই কি চেয়েছিলেন সেদিন রামতনু লাহিড়ির প্রিয় ছাত্র রাখাল? অশ্বিনী দত্তর ইস্কুলের ছাত্ররা কি এইদিন দেখার কথা ভেবেছিল কখনও? এক কাপড়ে জন্মভূমি থেকে প্রাণ হাতে করে যারা ছুটে গেলেন অন্যপারে, তাদের একমাত্র পরিচয় তারা উদ্বাস্তু। তারা উড়ে এসে জুড়ে বসা বাঙাল। ঘরেও নহে, পারেও নহে। মাঝখানে দড়ি টানাটানির খেলায় সে কাঠের পুতুল। তবুও নিজেকে হিন্দু ভেবে অপরাধ হয়। দেশভাগের বলি হয়েও সে গোড়া হিঁদুয়ানির পক্ষ নিতে পারে না। এককথায় দাগিয়ে দিতে পারে না, বাকিরা

সব উগ্রপন্থী। টেররিস্ট। কে যে কবে কখন উগ্র হয়ে উঠবে। পেটের ভাতে, পরনের কাপড়ে, মাথার ওপর ছাউনিতে আর ইজ্জতে টান পড়লে অসহায় প্রাণীও হাহাকার করে। সে কি শুধুই উগ্রতা?

"কাইল অনেক ভোরে উঠবার লাগব বউঠান। আইজ ঘুমান। বিশ্রাম লন। আমি যাই।"

মণি টুক করে উঠে পড়ে। বুদ্ধিমান ছেলে। ইমনের অস্বস্তি আর বাড়াতে চায় না সে। বুঝেশুনেই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায়।

মামীমা সন্ধে দিচ্ছিলেন একটু আগে। শাঁখের শব্দ। পর পর তিনবার। কতকাল পরে শাঁখের শব্দ শুনল ইমন। শেষ কবে শুনেছে ? খুব ছেলেবেলায় দিদা পুজোয় বসে শাঁখ বাজাচ্ছেন, এমন একটা ছবি আবছা ভেসে আসে মাথার মধ্যে। পাথরের থালায় সাবুমাখা হয়েছে। কলা, নারকেল কোরা, আখের গুড়, বাতাসার টুকরো, দু'চারটে নকুলদানা আর মাঝেমধ্যে কিশমিশ। অপার্থিব স্বাদ। কোনওদিন কাঁচা দুধ দিয়ে সিন্নি। সেদিন হয়ত বৃহস্পতিবার, সেদিন আকাশে থালার মতো পূর্ণিমা চাঁদ। আর সেইরকমই এক আলো ঝলমল জ্যোৎস্নারাতে বরিশাল শহরে এসে পৌঁছলেন দুর্গামোহন দাস। ইমন চোখ বুজলেই স্পষ্ট দেখতে পায় দুর্গামোহনবাবুর সভাপতিত্বে নতুন শক্তি নিয়ে জেগে উঠছে ব্রাহ্ম আন্দোলন।

.....

"নতুন টাউন কমিটি হইসে শোনলাম। কমিটিতে আপনে ছাড়া আর ক্যাডা আইলেন ?"

অনেক মক্কেলের মধ্যে লোকটিকে ঠিক চিনতে পারলেন না দুর্গামোহন। দুর্গামোহনের বাড়ির বাইরের ঘরে সকাল থেকেই ভিড়। স্বনামধন্য উকিল তিনি। অত্যন্ত অল্প বয়সেই তাঁর প্রচার এবং প্রসার লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর পিতা বরিশালে সরকারি উকিল ছিলেন। বাবার মৃত্যুর পরে বড়দা কালীমোহন সরকারি উকিল হন। দুর্গার পড়াশোনার অনেক অংশই কলকাতায়। জুনিয়র ও সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সেখানেই ছিলেন কিছুদিন। আঠারো শতকের নবজাগরণের হাওয়ায় যীশু খ্রিস্টের প্রতি তাঁর আকর্ষণ একটু বেশিই বাড়তে থাকে। কালীমোহন ভাইয়ের সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। কেরেস্তানদের খপ্পরে পড়ার আগেই কালবিলম্ব না করে তিনি ভাইকে নিয়ে চলে আসেন বরিশালে। নিজে কলকাতা হাইকোর্টে গিয়ে ওকালতি শুরু করেন। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের তরুণ দুর্গামোহন বরিশালে সরকারি উকিলের পদে নিযুক্ত হয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লেন সমাজ-সংস্কারের কাজে।

প্রতিদিনের সকালে মক্কেল মোক্তার ছাড়াও তাঁর বসার ঘরে সমাজের নানান শ্রেণির মানুষের ভিড়।

প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে তাকান দুর্গামোহন।

"টাউন কমিটির কথা আপনে জানলেন ক্যামনে ?"

"হেয়া আর কেই না জানে! আপনে আসেন শুনসি, আর শোনলাম স্বরূপবাবুর নামডা আসে। তাই ভাবলাম জিগাই আপনেরে ... আর কে কে আসে কমিটিতে?"

"সব ব্যাখ্যান জানার দরকারডা কি ?"

এড়িয়ে যান দুর্গামোহন। ব্রিটিশরা স্বায়ত্তশাসনের কথা ভাবছে। শাসকরা এবার সচেতন। পৌর জনপদের কাজ সামলাতে গেলে তাদের স্থানীয় কিছু সরকারি সংগঠন তৈরি করতেই হবে। মাত্র গত বছর তারা ডিস্ট্রিক্ট টাউন অ্যাক্ট পাশ করেছে। এই "টাউন কমিটি" তারই ফসল। প্রথম অধিবেশনটি শান্তিপুর্ণ ভাবেই হয়। জেলা শাসককে সভাপতি রেখে সহ-সভাপতি করা হয় মিস্টার ব্রাউনকে। ব্রাউন সাহেব অতিরিক্ত বিচারক। কোর্ট-কাছারিতে কখনও তাঁর মুখোমুখি হয়েছেন

দুর্গামোহন। ব্রাউন নিঃসন্দেহে বিদ্বান মানুষ। ম্যাথিউ সাহেব চিকিৎসক, তাঁকে কর্মসচিব করা হয়েছে। স্থানীয় কমিটিতে একজন প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসককে রাখতেই হত। কিন্তু ওয়েনসাহেবকে কেন রাখা হয়েছে তা' নিয়ে প্রথম অধিবেশনের পরেই ফিসফাস শুরু হয়। দুর্গামোহন ছাড়াও চণ্ডীচরণ রায়, মৌলবী তোফেল আহম্মদ আর স্বরূপ গুহ যুক্ত হয়েছেন টাউন কমিটিতে।

স্বরূপচন্দ্র গুহ অভিজ্ঞ মানুষ। তাঁর ওকালতির বিপুল অর্থে নিজে জমিদারি কিনে "রায়চৌধুরী" উপাধি পেয়েছেন সম্প্রতি। দানধ্যানও প্রচুর। এবার তিনি হাল ধরেন। তাঁর প্রাজ্ঞ মতামত মেনে নেয় উপস্থিত সকলে।

"সবেমাত্র অ্যাকখান কমিটি হইসে। এয়ার মধ্যেই কাইজ্যা বাধান ক্যান ? ভুইলেন না, আমাগো লড়তে হইব ওই ইংরাজদের লগে, নিজেদের মইদ্যে কাটাকাটি ছাড়ান দ্যান।" আরবি, ফার্সি, উর্দুভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি স্বরূপ গুহর। তাঁর ফার্সিভাষায় বিশুদ্ধ উচ্চারণে আইনের বক্তৃতা শোনার জন্য আদালতচত্বর লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়।

স্বরূপ গম্ভীর গলায় বলেন, "মাইনষে কয়, নবীনের মুসাবিদা আর আমার সওয়াল জবাব থাকলে সেই মামলায় জিত হইবই। আজ নবীনের মুসাবিদা করন লাগব না, আমিই কইত্যাসি, এই কমিটি দিয়াই কাজ শুরু হউক। অনেক পথ পাড়ি দিবার লাগব। অনেক কাজ বাকি। দ্যাশটারে গড়ার আগেই টুকরা কইরেন না। চলেন। আগাই ..."

সেইদিন স্বরূপচন্দ্রের প্রতিটি কথা হৃদয় স্পর্শ করেছিল যুবক দুর্গাচরণের। সত্যিই অনেক কাজ বাকি। সমাজের ধুলো-কাদা সরিয়ে তাকে ঝকঝকে বাসযোগ্য করে তুলতে হবে।

"উকিলবাবু, কইত্যাসি, আপনে অ্যাড়াইতেই পারেন, কিন্তু মৌলবি সাহেবরে ওই কমিটিতে কী কামে রাখলেন, হেইডা ..."

লোকটির কথা শেষ না হতেই হুংকার দিয়ে উঠলেন দুর্গামোহন, "লখা, অরে অ লখা ..."

দৌড়ে আসে দুর্গামোহনের ভৃত্যস্থানীয় কেউ।

"কয়েন কর্তা"। তাঁর এই হুংকার খুব স্বাভাবিক নয়। তিনি উচ্চগ্রামে কথা বললেই বাড়ির সকলে তটস্থ। কর্তার ম্যাজাজ চড়া, তার মানে, লক্ষ্মণ ভালো নয়। ঝামেলা বাধল বলে। আগাম সতর্ক হয়ে পড়ে সকলেই।

"আমার স্নানের জল দিসো?"

প্রশ্নকর্তাকে বুঝিয়ে দেওয়া, এবার মানে মানে উঠে পড়লে ভালো, তা না হলে কটুকথায় বিদায় জানাবেন এই দাপুটে মানুষটি। হিন্দুসমাজের তোয়াক্কা না করে ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মধর্মে তাঁর অনুরাগ আর সক্রিয় অংশগ্রহণ সকলের নজরে পড়েছে। কিছুদিন আগে এক ভদ্রলোক তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা করায় তার নামে দুর্গামোহন আদালতে মানহানির মামলা করেন। কিন্তু সে বেচারা জরিমানার টাকা জমা করতে না পেরে সাজা পায়। সোজা জেল হেফাজত। দুর্গামোহন নিজেই আবার তার জরিমানার টাকা জমা দিয়ে তাকে জেল থেকে রেহাই দেন। এই ঘটনাও শহরে প্রচারিত। নিন্দুকে যেমন তাঁকে কটূক্তি করে, তেমন তাঁর উদার মন নিয়েও সন্দেহ নেই কারও।

প্রশ্নকর্তা চুপচাপ উঠে পড়েন। টাউন কমিটি নিয়ে তাঁর কৌতূহল মেটে না। কমিটির মানুষজনকে নিয়ে আরও কিছু জানার ছিল।

দুর্গামোহন ধুপধাপ করে চলে আসেন অন্দরে। স্নান করা দরকার। মেজাজ চড়ে যাওয়া ভালো লক্ষণ নয়। উকিলের পক্ষে তো খুবই ক্ষতিকারক।

"আইজ আবার কী হইল?" দরজার আড়াল থেকে ব্রহ্মময়ীর ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট কণ্ঠ ভেসে আসে।

দুর্গামোহনের তরুণী স্ত্রী ব্রহ্মময়ী আলোকপ্রাপ্তা মহিলা। দিনের আলোয় অন্তঃপুরে স্বামীসন্দর্শনে তিনি স্বচ্ছন্দ। ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ও প্রসারে তিনি সক্রিয় অনুগামিনী।

"ত্যামন কিসুই না। আইজ সাঁঝের কালে সমাজে যাওয়া লাগব। মনে আসে তো?"

ঘাড় নাড়েন ব্রহ্মময়ী। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই নিয়ম করে ব্রাহ্ম সমাজের প্রার্থনায় যোগ দিচ্ছেন ব্রহ্মময়ী।

"তোমার সইরে গিয়া কইয়ো এইবার গায়েমুখে চুনকালি মাখনের সময় হইসে..."

"আমার সইরে লইয়্যা ভাইব্যেন না। আমরা এইভাবেই থাকুম। কালি আবার কীসের? চাইপ্যা ধুইলেই উইঠ্যা যাইব গিয়া।"

দুর্গামোহন মুখ টিপে হাসেন। দাপট বটে মহিলার। এমন স্ত্রী নাহলে সংসার চলে না।

চণ্ডীচরণ রায়চৌধুরী শহরের ঠিক মধ্যস্থলে ব্রাহ্ম উপাসনার জন্য যে মন্দির তৈরি করেছেন তাতে দুর্গামোহন প্রথমেই এককালীন পাঁচশো টাকা দান করায় আরও অনেকে উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে আসেন। এগিয়ে আসেন ব্রহ্মময়ী নিজেও। উপাসনাগৃহে সকলের সামনে গলার মটরমালাটি খুলে দান করে দিয়েছিলেন তিনি। দেখাদেখি রাখালবাবুর স্ত্রী সৌদামিনী প্রকাশ্যে খুলে দেন তাঁর বিছেহার। সেখানেই সই পাতিয়ে নেন দুজন। গলায় গলায় বন্ধুত্ব দুজনের। রাখালচন্দ্র আর দুর্গামোহনের ব্রাহ্মমন্দিরের প্রথম ট্রাস্টি। তাঁদের সহধর্মিনীরা উৎসাহী হয়ে পাশে না থাকলে এই কাজের গতি রুদ্ধ হত সন্দেহ নেই।

"বরিশালে বরাবর উকিল-রাজ ... দরখাস্ত করা থিক্যা আন্দোলন অবধি সবই তো উকিলগো করা লাগে ... তবে কীর্তিপাশার রোহিণীবাবু, লাখুটিয়ার রাখালবাবু কিংবা বাসন্ডার হ্যামন্তবাবুর মত জমিদাররে পাশে না পাইলে কী হইবে কওয়া মোশকিল।"

"ডরাইবেন ক্যান? আগাইতেই হইব। ভাবেন দেহি, আমাগো মাইয়ামাইনষের কষ্টডা কম?"

চমকে তাকান দুর্গামোহন। খুব নিঃশব্দে ব্রাহ্মপদ্ধতিতে মেয়েদের বিবাহ অনুষ্ঠানের শুভ সূচনার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁরা। আগে পাশে চাই ব্রহ্মময়ী, সৌদামিনীদের। সরকারি চাকুরে সর্বানন্দ দাশ নিজে এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে লাখুটিয়া নিয়ে যাওয়াতে এক নতুন জটিলতা তৈরি হয়েছে রাখালবাবুর পরিবারে। গোঁসাইজীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে রাখাল এবং সৌদামিনী তাঁর কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। ছোট ভাই প্যারীলালও যোগ দিয়েছেন দাদার সঙ্গে। কিন্তু শোনা যাচ্ছে তাঁদের বিধবা মা এবার তাঁদের বিধর্মী বলে সম্পত্তিচ্যুত করবেন বলে দেওয়ানি আদালতে মোকদ্দমা করছেন। রাখালচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের অন্যতন শক্তিশালী এক স্তম্ভ। তাঁর যে কোনও বিপর্যয়ে দুর্গামোহন পাশে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর।

(৯)

"ম্যাগ করসে নয়াবউ। আন্ধার চাইরদিক। অ্যাহনো হুইয়া আসো দেহি। শরীল গতিক ঠিক আসে তো ?"

বনমালী বাড়ি ফেরেন না এইসময়। কাঠপট্টিতে তাঁর ওষুধের প্রস্তুতি চলে। জ্বরের সিরাপ, পেটের অসুখের বড়ি, সর্দি-কাশির মিক্সচার, চর্মরোগের কিছু বিশেষ মলম তৈরি হয় তাঁর নিজস্ব ফর্মুলায়, নিজের কঠোর তত্ত্বাবধানে। শুধু ওষুধ তৈরি নয়, পেটেন্ট নেওয়া সেই ওষুধ চলে যায় দূর-দূরান্তে। বরিশাল শহর ছাড়িয়ে গ্রামে-গঞ্জে মফঃস্বলে। পরিবর্তে নৌকায় আসে বস্তা-ভর্তি মোহর। বিনোদিনীর উপস্থিতিতে সেই মোহর গোনাগুনতি হয়ে চলে যায় সিন্দুকে।

অবেলায় অন্তঃপুরে বনমালীর গলা পেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসেন বিনোদিনী। শরীর তাঁর সত্যিই ভালো নেই। কোলের সন্তানটি জন্মের দুদিনের মাথায় ইহকালের মায়া ত্যাগ করেছে। আঁতুড়ঘর ছেড়ে বেরোনো ইস্তক শরীর দুর্বল। মাথা টলমল করে। প্রথম সন্তানের অকালমৃত্যু তাঁকে বারে বারে পীড়িত করছে। অনেক স্বপ্ন ছিল তাকে নিয়ে। গাঁয়ে-গঞ্জে শিশুমৃত্যু অবশ্য নতুন কিছু নয়। অপুষ্ট নারীশরীর গর্ভধারণের জন্য প্রস্তুত হবার আগেই তাকে প্রতি বছর ঢুকতে হয় আঁতুড়ঘরে। তেরো থেকে তিরিশের নারীশরীর বারো-চোদ্দটি সন্তানধারণের কষ্ট সহ্য করে হাসিমুখে। যেন এটিই ভবিতব্য। এতেই নারীজন্মের সার্থকতা। নবজাতক ভূমিষ্ঠ হয়ে দু'চারদিন পৃথিবীর আলো মাখে। কিংবা মায়ের হয় প্রাণসংশয়। অথবা সন্তানটি জন্মের আগেই পৃথিবীর মায়া কাটায়। বছর কয়েকের শিশুর মৃত্যু যেন জলভাত। খুব সামান্য কান্নার ধ্বনি, আবার নিত্যনৈমিত্তিক জীবনযাপন। যারা বেঁচে যায়, তারা ভাগ্যবান। যে মায়ের সব ক'টি সন্তান তরতাজা, সেই মা স্বর্ণগর্ভা।

কিন্তু গাঙ্গুলী পরিবার বরাবর ব্যতিক্রম। বল ভালো, ব্যতিক্রমী পুরুষ স্বয়ং বনমালী গাঙ্গুলী। তাঁর জগতে এই শিশু মৃত্যুশোক, অপরিণত বয়সের গর্ভধারণের সমস্যা অস্বাভাবিক। নিজে চিকিৎসক বলে নয়, একজন দরদী মনের মানুষ বলেই বোধহয় দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর যথাযথ যত্নে কোনও ত্রুটি রাখেননি তিনি। সন্তানমৃত্যুতে সংসারের শুভ কাজে বিনোদিনীর পিছিয়ে থাকার সামাজিক বিধান নিয়েও তিনি পরোয়া করেন না। বিনোদিনী নিজেও জানেন, পরিবারে তাঁর সম্মান এবং প্রয়োজনীয়তা সেই আগের মতোই রয়েছে।

অপূর্ণতার একটা কাঁটা কোথাও বড় বিঁধে থাকে। এই যন্ত্রণা তাঁদের প্রাপ্য ছিল না।

তবুও এই যন্ত্রণা তাঁদের সইতে হয়। একবার নয়। বেশ কয়েকবার। একের পর এক মৃত্যু। কচিমুখের আসা-যাওয়া।

সংসারে যে যত সইতে পারে, ওপরওয়ালা বোধহয় তাঁকে তত ভার বইতে দেন। এইভাবেই এখন মেনে নিয়েছেন বিনোদিনী।

"ছ্যামড়াটার উদ্দণ্ডপনায় একটা অঘটন না ঘটে"। বংশের প্রদীপ একমাত্র পুত্রটিকে নিয়ে চারদিকে ত্রস্ত সকলে।

আবার গর্ভধারণ করেছেন বিনোদিনী। আবারও কন্যা। এখনও পর্যন্ত সুস্থ শরীরে হেসেখেলে বেড়ে উঠছে সে। কিন্তু এবার বিপদ এল অন্যদিক থেকে। মাত্র তিনমাস বয়সের কচি কন্যাটিকে সতীনপুত্রের দুরন্তপনার হাত থেকে বাঁচাতে পারে না কেউ। দামাল কিশোর ছুটে ছুটে যায় জ্যান্ত খেলার পুতুলটিকে চটকাতে। তার হাতে ধুলোবালিকাদা। তার সারা গায়ে রাজ্যের জঞ্জাল। আর তার মাথার ওপরে স্নেহ আর প্রশ্রয়ের অবারিত হাত। বিনোদিনী প্রমাদ গোনেন। একটি সন্তান হারিয়েছেন। আর তিনি একই যন্ত্রণা ভোগ করতে চান না।

মরিয়া হয়ে শরণাপন্ন হন স্বামীর।

"অ্যাকখান আর্জি আসে আমার"।

"কইয়া ফ্যালাও নয়াবউ। আকাশডা ভাইঙ্গা পড়ে, অ্যামন কিসু কইয়ো না।"

বিনোদিনী সাহস সঞ্চয় করেন। গাঙ্গুলী বংশের প্রথম পুত্র সম্পর্কে তার সতীনের পুত্র। তার হাত থেকে নিজের কন্যাসন্তানকে রক্ষা করতে চাওয়ার অর্থ অতি গূঢ়। খুব সূক্ষ্মস্তরে বংশধরের বিরুদ্ধে একপ্রকারের গুরুতর নালিশ।

"খুকিরে লইয়্যা একবার বাপের ঘরে যামু মন করসি। দিন দুই থাইক্যা ... আপনে রাজি না হইলে ..." কথা অসমাপ্ত রাখেন বিনোদিনী। সরাসরি মেয়ের সুরক্ষা না চেয়ে একটু ঘুরপথে পৌঁছলেন নিজের অভীষ্ট সিদ্ধিতে। কোনওরকমে গৈলা-ফুল্লশ্রী পৌঁছতে পারলে শিশুকন্যাটিকে রেখে আসবেন বাপের বাড়িতে। সেই অবোধ শিশুটি সেখানেই কিছুদিন থাকুক।

মাতৃস্নেহ না পেলেও মায়ের মতো স্নেহ-আদরের মানুষের অভাব হবে না সেখানে। অন্তত দুষ্টু দাদার আদর নামক অত্যাচারের হাত থেকে তো রেহাই পাবে।

"এই অ্যাকখান কথা কওনের লাইগ্যা অ্যাতো ভাবলা নয়াবউ? আমি কাইলই নাও লাগাইতে কই। যখন খুশি যাবা, যেইদিন মনে লয়, আইবা ... অ্যাতো চিন্তা কইরো না।"

বিনোদিনী আশ্বস্ত হন।

.....

"বৌঠান, বিনোদিনীর এই কন্যাই কি আপনের মায়ের দিদিমা সুশীলা?"

"না মণি। বিনোদিনীর এই কন্যাটিও বাঁচেনি বেশিদিন। বিনোদিনী তাঁর তিনমাসের কচি মেয়েকে গৈলা-ফুল্লশ্রীতে তাঁর বাপের বাড়িতে রেখে চলে আসেন। নিশ্চিন্ত ছিলেন। সেখানে দুষ্টু ছেলের দৌরাত্মির হাত থেকে অন্তত মেয়েটি বাঁচবে। কিন্তু বিধাতা অন্য কিছু ভেবে রেখেছিলেন। মাসকয়েক পরে আবার তাকে ক'দিনের জন্য নিজের কাছে আনতে গিয়ে দেখেন, মেয়েটি মাকে ছেড়ে একলাই দূর আকাশে পাড়ি দিয়েছে। ওই শোক বিনোদিনী সহ্য করতে পারেননি। ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। কোথাও যেন একটা অপরাধবোধ কাজ করছিল। কেন রেখে এলেন তাকে? সে কি তবে শুধু অভিমান করে সরে গেল? বনমালী গাঙ্গুলী বলেই সে যাত্রা বিপর্যয় সামাল দিতে পেরেছিলেন।"

ভোরের হাওয়ায় কীর্তনখোলা নদীর বাঁধানো তীরে অনেকেই হাঁটেন। উত্তরে হাওয়া আছে, কিন্তু কনকনে ঠান্ডা কামড় বসায় না। সূর্যের আলো ধুয়ে দিচ্ছে চরাচর। প্রতিদিন যেমন সূর্য নির্মল আলোয় মুছে নিতে চায় সমস্ত গ্লানি, কালিমা, এক রাতের আঁধার। প্রকৃতি তার নিজের নিয়মে পরিশুদ্ধ হয়। চারপাশের গাছের পাতায় সতেজ সবুজ ঝলমলে আলো। তারা মাথা নিচু করে অভিবাদন করে সূর্যকে। নদীর ধারে পাখির ভিড়। রাস্তা এখনও জনবিরল। শীতের সকালে ব্যস্ততা চেপে বসেনি তেমন।

মণি আর ইমন অনেক সকালেই চলে এসেছে কীর্তনখোলার ধারে।

"অদ দেইখ্যা হাঁটেন বউঠান"।

অবাক হয়ে তাকায় ইমন।

"অদ কী মণি ?"

মনিরুদ্দিন হা হা করে হেসে ওঠে।

"অদ জানেন না? অদ হইল গর্ত। আর হিদলা হইল শেওলা। এই নদীর ঘাটে বসনের সময় ওই অদ আর হিদলা দেইখ্যা বসবেন, এইডাই কইয়্যা দিলাম আর কি ... আপনেগো দ্যাশের ভাষাতেই তো কইলাম। বোজলেন না?"

"ঠাট্টা করছ আমার সঙ্গে? খুব রেগে যাচ্ছি কিন্তু !" রেগে যেতে গিয়েও হেসে ফেলে ইমন। এই ছেলেটার মধ্যে আশ্চর্য প্রাণশক্তি। ওকে দেখে মনে হয়, ও কোনও দুঃখের নীল রঙ সইতে পারে না। সেইজন্যেই বিনোদিনীর দ্বিতীয় কন্যার অকালমৃত্যুর কাহিনি অসমাপ্ত রেখে চট করে অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়। ইমন এত সহজে মুছে ফেলতে পারে না সেই তুচ্ছ ঘটনাটিও। বেশ বুঝতে পারে সহ্যশক্তির জীবন্ত প্রতিমূর্তি বিনোদিনী তাঁর দ্বিতীয় সন্তানের মৃত্যুর পরেও পাথরের মতো আবার গর্ভধারণ করছেন। আর সেই লক্ষণ পরিস্ফুট হওয়ার আগেই কুলীন ব্রাহ্মণ বনমালী গাঙ্গুলীকে বিয়ে করে নিয়ে আসতে হচ্ছে তাঁর তৃতীয় পক্ষ।

"একটা কটু কথা কই বউঠান, মনে কিসু কইরেন না। হিঁদু বামনাদের এই এতগুলি শাদি-নিকার কী প্রয়োজন কইতে পারেন ?"

"কুলীন সৎ ব্রাহ্মণের তখন বড় আকাল মণি। এদিকে ব্রাহ্মণের ঘরে কিশোরী কন্যার অভাব নেই। সময়মতো পাত্রস্থ করতেই হবে। নইলে আবার সেই জাত-ধর্ম খোয়ানোর ভয়। শুধু পাত্রস্থ নয়, গৌরীদান করা চাই। আট বছরের কন্যার সঙ্গে আশি বছরের কুলীনের বিয়ে তখন আকছার হত। এ আর নতুন কথা কি! সেই অষ্টাদশ শতকে মেয়েদেরই বা উপায় কি! তারা লেখাপড়া করে রোজগার করে ঘরে পয়সা আনবে না। কাজেই মেয়ের বাপেদের আক্ষরিক অর্থেই কন্যাদায়। সমাজে বাঁচতে হবে যে। অতএব কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিয়ে দাও, মেয়েটি বরং বাপের ঘরেই রইল। স্বামী দয়া করে ন'মাসে ছ'মাসে একদিন শ্বশুরবাড়ি এলেন, জামাই-আদর ভোগ করলেন। কয়েকদিন থেকে বৈধ স্ত্রীকে ভোগ করে আবার তাঁর ফিরে যাওয়া। আর নয়ত সারাজীবনে আর খোঁজ-খবর নিলেন না। একদিন হয়ত স্বামীর মৃত্যুর খবর এল, ঘরে এবার আইবুড়ো মেয়ের বদলে এক কাঁচা বয়সের বিধবা জুটল। তার পেছনে অবশ্য খাওয়া-পরার খরচ কম।" বলতে বলতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইমন।

"নাটক নভেল সিনেমায় এমন গল্প দেখায়, কত বইতে পড়েছি, শুধু কষ্ট বাড়ে মণি। কিন্তু সত্যিই তখন কোনও উপায় ছিল না। মেয়ে জন্মালে ঘরে কান্নার রোল উঠত।"

"বনমালী গাঙ্গুলী তৃতীয়বার বিয়া করলেন ?"

"হ্যাঁ মণি। চাপে পড়ে বিয়ে করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু উনি স্ত্রীকে বাপের বাড়িতে রেখে দেবার তীব্র বিরোধী ছিলেন। ব্রাহ্মণের ধর্ম তিনি রক্ষা করেছেন ঠিকই, কিন্তু স্বামীর কর্তব্যে অবহেলা করেননি। বাড়ির বড় বউ সুনয়নী, মেজ বউ বিনোদিনী আর তৃতীয় পক্ষের কমলা, তিনজনের ঘর ছিল একই মাপের, একই আসবাবে সাজানো। পরপর তিনটি ঘরে ঢুকলে কেউ বুঝতে পারবে না কোনটি কার ঘর। কোনও পক্ষপাতিত্ব তো দূরস্থান, আদরযত্ন আর সম্মানের জায়গা সকলের জন্য বরাদ্দ। এ যেন নিক্তি মেপে ভাগ করা।"

"এই গল্প ফুরায় না, চলেন বউঠান, বাড়িখান এইবার দ্যাখাইয়া লইয়া আসি আপনেরে।"

"চলো মণি। আজ সকালে কীর্তনখোলার ধারে বসে অনেক অকালমৃত্যুর কাহিনি মনে পড়ছে। বিনোদিনীর প্রথম দুটি সন্তান, বনমালী গাঙ্গুলীর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী কমলা ..."

মণির চোখদুটি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

"এই যে কইলেন, একইরকম ঘর, সম্মান ..."

"সবই একরকম। শুধু আয়ুর মাপ আলাদা মণি। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী, যার বিয়ে হয়েছে এগারো বছর বয়সে সে পুরো বারো বছর অবধিও বাঁচেনি। প্লেগ হয়েছিল তার। সেই মারাত্মক প্লেগের মড়ক শুরু হয়েছে তখন। আর তার শিয়রে রাত জাগছেন কে জানো ? রাত জেগে বসে আছেন বিনোদিনী। তার সতীন। অক্লান্ত সেবায় সন্তানের স্নেহে তাকে আগলে রাখতে চেয়েছেন এক প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারের বউ। সেবা-শুশ্রূষায় মানুষের পরমায়ু বাড়ে না মণি, শুধু সেবিকার যন্ত্রণা বাড়ে। শুনেছি শেষ নিঃশ্বাস ফেলার মুহূর্তেও বিনোদিনীর আঁচলের কোনাটি তার হাতের মুঠোতে ধরা ছিল।"

একগোছা কাগজ নিয়ে হেঁটে আসে এক কিশোর। এসে দাঁড়ায় ওদের কাছে। মুখে স্মিত হাসি। একটি কাগজ ইমনের দিকে এগিয়ে দেয় সে।

"এই ন্যান আপা।"

কাগজে লেখা "কীর্তনখোলা বাঁচাও"। আরও অনেক কথা। নদী বাঁচানোর আন্দোলন। পরিবেশ রক্ষার কর্মসূচী। কাগজটিতে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে কিশোরটির দিকে তাকায় ইমন।

"ইণ্ডিয়া থিক্যা আইসেন আপা ?"

"কেমন করে বুঝলে তুমি ?"

উত্তরে ভারি মিষ্টি হাসে সেই নবীন কিশোর।

"অ্যাকবার দেইখ্যাই বুঝছি। আপা, আমাগো এই নদীটার কথা ল্যাখবেন?"

"লিখব ? তুমি কেমন করে ভাবছ আমি লিখব?"

"ওই যে কইলাম, দেইখ্যা মনে হইল। হগলে ল্যাখে। জানি। ফেসবুকে তো ল্যাখেই। আপনেও অ্যাকবার ল্যাখবেন আপা। জানুক মাইনষে। ওই দ্যাশের লোকও জানুক। আমাগো এই নদীডার বড় বিপদ।"

বিপদ কোথায় নেই? সময়ের বিবর্তনে স্রোতস্বিনী নদীর বিরাট অংশ দখল হয়েছে, শিল্প আর সভ্যতার দূষণে নদীর পানি কলুষিত। নৌ-যোগাযোগ সংকটে। লঞ্চ আটকে থাকে চড়ায়। সংযোগ খালগুলোর উৎসমুখে পলি জমছে। মরে যাচ্ছে একের পর এক খাল। নতুন প্রজন্মের মানুষ পরিবেশকে আর পাল্টাতে চায় না। তারা সর্বনাশের দিন গুনছে। সচেতন হয়ে গড়ে তুলছে জনমত। কিন্তু রাজনীতির ব্যাপারী আর অর্থনীতির নিয়ন্তা ধনী ব্যবসায়ীদের দাপটে সত্যিই কি বাঁচবে কীর্তনখোলা ? বাঁচবে পদ্মা, গঙ্গা, তিস্তা ? কেন কে জানে, ইমনের হঠাৎ বিনোদিনীর অকালমৃত সন্তানদের কথা মনে পড়ে। এই চরেই কি আজও কোথাও ভেসে বেড়ায় তাদের দীর্ঘশ্বাস ?

(চলবে)

শ্যামলী আচার্য – কর্মসূত্রে 'আজকাল', 'আবার যুগান্তর', 'খবর ৩৬৫' ও অন্যান্য বহু পত্র-পত্রিকায় এবং ওয়েবজিনে ফিচার এবং কভারস্টোরি লেখার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। 'একদিন' পত্রিকার বিভাগীয় সম্পাদক হিসেবে কাজের সুযোগ। গাংচিল প্রকাশনা থেকে তাঁর প্রথম গল্প সংকলন 'অসমাপ্ত চিত্রনাট্য'; সংকলনের গল্পগুলি বিভিন্ন সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকা, সানন্দা, এই সময়, তথ্যকেন্দ্র পত্রিকায় প্রকাশিত। "রা" প্রকাশন থেকে তাঁর দ্বিতীয় গল্প সংকলন 'প্রেমের ১২টা'; সংকলনের গল্পগুলি বিভিন্ন সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকা, সানন্দা, উনিশ-কুড়ি, একদিন, প্রাত্যহিক খবর এবং বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত। বহুস্বর পত্রিকার পক্ষ থেকে মৌলিক গল্প রচনায় 'অনন্তকুমার সরকার স্মৃতি পুরস্কার'। অভিযান পাবলিশার্স আয়োজিত মহাভারতের বিষয়ভিত্তিক মৌলিক গল্প রচনায় প্রথম পুরস্কার। এছাড়াও গবেষণাঋদ্ধ বই 'শান্তিনিকেতন'। প্রকাশক 'দাঁড়াবার জায়গা'। ১৯৯৮ সাল থেকে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের এফ এম রেইনবো (১০৭ মেগাহার্তজ) ও এফ এম গোল্ড প্রচারতরঙ্গে বাংলা অনুষ্ঠান উপস্থাপিকা। কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রের ভয়েস ওভার আর্টিস্ট।

ধারাবাহিক

সৌমিত্র চক্রবর্তী

সময়

পর্ব ১২

প্রান্তিক স্টেশনে নামতেই মনটা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। প্রতিবারই হয় এটা। বাড়িতে দুটো গাড়ি থাকা সত্বেও এখানে গাড়ি আনতে মন চায়না একদম। যদিও গাড়িতে আসাটাও ভারী রোমাঞ্চকর, বিশেষত ইলামবাজারের আদিম জঙ্গলটার একটা আলাদা মাদকতা আছে। হয়তো শিয়ালের বাইরে কোনও অন্য জন্তুই নেই, তবু মনে হয় যেন এখুনি গাছ মড়মড়িয়ে বেরিয়ে আসবে হাতির পাল। মাঝে মাঝে গরুর গাড়ি দেখা যায়, তারা বাঁধানো পথ ধরে চলতে চলতে হঠাৎ ঢুকে পড়ে অরণ্যের লালচে পথে নির্দিষ্ট গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। তবে একা এলে সাধারণত ট্রেনেই আসে, ইন্টারসিটিটা দুপুরে ধরলে সন্ধ্যার মুখে প্রান্তিকে নামিয়ে দেয়। তারপর রিক্সা ধরতে পারলেই ফুলডাঙ্গা সাঁওতালপল্লি। রিক্সাওয়ালারা চিনে গেছে তাকে। দেখলেই দিদিমণি দিদিমণি বলে ডাকতে থাকে। এই দিদিমণি ডাকটা চলে এখানে সবার মুখে। খুব একটা কেউ তার নাম জানে বলে মনেও হয়না। সেও বলেনা তার নিজের নাম কাউকে। তার সবচেয়ে বড় স্বস্তি যে এখানে কেউ তার নাম ধরে না ডাকুক, অন্তত মিসেস দত্ত বলে ডাকেনা। এই ডাকটা অসহ্য একবারে।

আজ সুভাষ দাঁড়িয়েছিল রিক্সা নিয়ে। তাকে দেখেই একগাল হাসল আর তারপর রিক্সার প্যাডেলে চাপ দিতে দিতে জানালো, "দিদিমণি, আরেকটা কবিতা মুখস্ত করে ফেলেছি আপনি যেমন বলেছিলেন। ওই যে ওইটা, "একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু" টা। শুনবেন ?"

এই সুভাষ ভারী অদ্ভুত ছেলে। রিক্সা চালায় বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বেশ খোঁজ খবর রাখে সুভাষ, যেমন শান্তিনিকেতনের ইতিহাস, ঠাকুর বংশের বৃত্তান্ত, ইত্যাদি। ভ্রমনার্থীদের রিক্সায় করে ঘোরানোর ফাঁকে ফাঁকে সে তথ্যগুলো উগরাতে থাকে আর তাতে ভাড়ার সঙ্গে বকশিশও মিলে যায়। দুয়েকটা কবিতাও শিখে রেখেছে ছেলেটা, ভাষ্যের ফাঁকে ফাঁকে জুড়ে দেয়। শান্তিনিকেতনের অধিকাংশ রিকশাওয়ালারা অবশ্য ঘোরানোর ফাঁকে ইতিহাস বলে গাইডের কাজটাও করতে থাকে। এটা অনেক জায়গাতেই চালু প্রথা যেমন জব্বলপুরের মার্বেল রক দেখানোর সময় প্রতিটি নৌকাওয়ালা জায়গাটার বিবরণ দেয় একটা ছড়ায়। সবাই একই জায়গায় একই পঙক্তিগুলো বলতে পারে, কারও ভুল হয় না। কিন্তু সুভাষের নতুনত্ব ওই কবিতা বলা, যদিও তার সংগ্রহ সীমিত, তাই নতুন কবিতা শিখতে বলেছে সে সুভাষকে। সুভাষ তারই পরীক্ষা দিচ্ছে এখন।

সাঁওতাল পল্লি দিয়ে এসে বাড়ির সামনে নামতেই ছুটে এলো তাপস। তাপস ও বাড়ির কেয়ারটেকার, ভারী ভালো ও দায়িত্বশীল ছেলে। এই ভরসন্ধ্যায় রিক্সা দেখে বুঝেছে সে যে এই বাড়ির মালকিন হাজির। প্রায় দু বিঘা জমির উপর বিশাল বাগানের মধ্যেকার এই বাড়ির মালিককে বিশেষ আসতে দেখেনি তাপস, খালি দিদিমনিই প্রতি সপ্তাহের শেষে এখানে আসেন আর দিদিমণির আসবার দিনে বিকেল থেকেই সাঁওতালপল্লির বাচ্চাগুলো ভিড় জমাতে থাকে এ বাড়িতে। অপেক্ষায় থাকে কখন দিদিমণি আসবেন তাদের নাচ গান কতদূর এগোলো পরীক্ষা করবেন।

তারও বড় ভালো লাগে এখানে আসতে। ফুলডাঙ্গার এই সাঁওতালপল্লিতে আধুনিকতা প্রবেশ করেছে বটে, কিন্তু এখনও এদের জীবনযাত্রা বড় প্রাচীন। ছেলে মেয়েগুলো আজকাল লেখাপড়া শিখছে বটে, কিন্তু জীবনের সুকুমার বৃত্তিগুলো এখনও অজানা এদের। কয়েক বছর আগে একটা এনজিও-র হয়ে সমীক্ষায় এসে এটা সে টের পেয়েছিল খুব। নিজের ছেলের সঙ্গে তুলনা করে বাচ্চাগুলোর উপর গভীর মমতা অনুভব করেছিল সে। মনে হয়েছিল, এদের জন্য কিছু করা

দরকার, করা উচিৎ। তার বর তার মতো ভাবতে পারেনা বটে কিন্তু তার চিন্তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেনা কখনও। তাই এই দু বিঘা জমি কিনে একটা বাড়ি তৈরি করেছে সে এখানে। সপ্তাহান্তে এখানে আসে, এখানকার বাচ্ছাদের নাচ, গান, আঁকা শেখায়। প্রথম প্রথম উদ্দেশ্যটা বোঝাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল, কিন্তু ছ'মাস যেতে না যেতেই সাঁওতালপল্লির মানুষেরা বুঝে গেল যে এই দিদিমণি অন্যরকম, সে অন্য শহুরে বাবুদের মতো শুধু তাদের দেখতে আসেনি, তাদের একজন হতে এসেছে। বাবুদের বাচ্চারা যেসব নাচ-গান জানে এখন থেকে তাদের বাচ্চারাও জানবে শিখবে এইসব। এখন তো প্রায় ৫০ জনের মত ছাত্র ছাত্রী তার। শনিবার সন্ধ্যায় দেখে নেওয়া হয় গত সপ্তাহের শেখানো নাচ গান কে কতটা তুলতে পেরেছে। আর রবিবার সকালে নতুন একদফা নাচ গান সেখান হয়, সঙ্গে আঁকাও। খুব উৎসাহ পায় বাচ্চাগুলো এদের চোখে মুখে আনন্দ আর গর্ব ঝলমল করতে থাকে।

আজ জমির ভিতর ঢুকতেই বিকু ছুটে এল। বছর দশেকের ছেলেটা একগাল হেসে তার সামনে দাঁড়ালো, সে যেন জানে আজ শুধু তার জন্য বিশেষ কিছু একটা হবে যা অন্য বাচ্ছাদের ভাগ্যে নেই। দিদিমণি গাল টিপে মিষ্টি করে "হ্যাপি বার্থডে" বলতেই একরাশ হাসি ছড়িয়ে পড়ল বিকুর মুখে আর সে চেঁচিয়ে বলল "থাঙ্কু"। আজ বিকুর জন্মদিন। দিদিমণি সবার জন্মদিনের খেয়াল রাখে আর সেদিন হাতে করে নিয়ে আসে কলকাতা থেকে ইয়াবড় কেক যেমন সিনেমায় দেখায়। মোমবাতি জ্বলে, সবাই গান গায়, উফ ! দারুণ মজা হয়। আজও হল। তারপর নাচ গানের উন্নতি দেখতে দেখতে রাত গড়িয়ে গেল।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পরে একটু হাঁটতে বেরোয় সে। অন্ধকার থাকে বটে, কিন্তু হাতে একটা টর্চ থাকলে অত সাপের ভয় থাকে না। পথ চলতে চলতেই দেখা হয়ে গেল লক্ষীমণির সঙ্গে। উত্তরপল্লীর বাবুর বাড়ি কাজ করে ফিরছে সে। দিদিমনিকে দেখে একগাল হাসল লক্ষীমণি। দিদিমণি তার বড় প্রিয় মানুষ।

"কি লক্ষ্মী খবর কি ? কাজ করে ফিরছো ?" ভারী নরম গলা দিদিমণির। এমন ভাবে কথা বলে দিদিমণি যেন কত আপনজন।

"ওই আছি আর কি! কি বলবো দিদিমণি পাঁচ বছর হয়ে গেল কাজ করছি বাবু বাড়িতে, এখনও এক পয়সা মাইনে বাড়লোনা, সেই আটশো টাকাই চলছে, আবার এদিকে বন্ধু জুটিয়ে অসভ্যতা করার শেষ নেই। বাবুর এক বন্ধু এসেছে, রঞ্জনবাবু বলে, বউ নিয়ে এসেছে দিদিমণি জানো, তাও আমাকে আড়ালে ডেকে বলে কিনা রাতে এসো। আমি না বলাতে আবার জোর করে হাত ধরে বুকের উপর টেনে অসভ্যতা করে দিল"।

"তুমি কিছু বললেনা লক্ষ্মী ?"

"কি বলব দিদিমণি ? কে বিশ্বাস করবে আমার কথা ? মাঝখান থেকে চাকরিটাই যাবে। গরীব মেয়েছেলে, আমারই চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাবে"।

"না, লক্ষ্মী। এটা ঠিক নয়। কাল সকালে আমি যাব তোমার সাথে ওদের বাড়ি যখন তুমি কাজে যাবে। ওই রঞ্জনবাবুকে ক্ষমা চাইতে হবে তোমার কাছে"।

"সত্যি যাবে দিদিমণি ?"

"হ্যাঁ", জোরের সঙ্গে শব্দটা উচ্চারণ করে লক্ষ্মীর কাঁধটা সজোরে ধরে সে।

পরেরদিন সকালে তো প্রথমে সেই রঞ্জনবাবু রেগেই অস্থির। লোকটাকে দেখলেই বোঝা যায় দুর্বিনীত রগচটা ধরনের। কিছুতেই স্বীকার করবেনা সে এমন কিছু করেছে। তার বউ তো স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাশে। লোকটা তার উপর অনেক হম্বিতম্বি করতে লাগলো। শেষে তার দৃঢ়তা দেখে বুঝল এ মহিলা একটু অন্যরকম। তখন সুর নরম হয়ে আসতে লাগলো। শেষে পুলিশের ভয় দেখাতে হাত জোড় করে লক্ষ্মীর কাছে ক্ষমাই চেয়ে ফেলল।

ফেরবার পথে মনটা ভালো হয়ে গেল। সকালবেলা একটা সত্যিকারের ভালো কাজ করা গেল। মেয়েদের খুব সহজলভ্য ভাবে কিছু মানুষ, পদে – পদে অপমান করে। ফুলডাঙ্গা বাবুপাড়ার মধ্যে দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে একটা বাড়ির সামনে পা আটকে গেল তার। প্রতিবারই হয়। বাড়িটার নাম একা এবং কয়েকজন, মালিক সদ্যপ্রয়াত, নাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তার স্বপ্নের লেখক, তার জীবনের ধ্রুবতারা। সাধারণ দোতলা বাড়ি, সঙ্গে একটা পুকুর, তাতে হাঁস চরছে। বাড়িটা দেখামাত্র একটা পুরনো আক্ষেপ ঘিরে ধরল মনটাকে। ইস, সুনীল বেঁচে থাকতে কতবার ভেবেছে যে একবার আসবে, দেখা করবে তার স্বপ্নের পুরুষের সঙ্গে। সাহসে কুলোয়নি, সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ভেবেছে কি বলবে সে এত বড় ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়িয়ে। তারপর তো লোকটা চলেই গেল হঠাৎ। এখন বড় আক্ষেপ হয়, মনে হয় একবার দেখা করলে হত। আবার মনে হয় সুনীলের দেখা পাওয়া তার ভাগ্যে ছিলনা, না হলে বার বার সুযোগ এত কাছে এসে ফস্কে যায় জীবনে!

বিকালের দিকে একটা রিক্সা নিয়ে কোপাই পেরিয়ে একটা সাঁওতাল গ্রামে চলল সে। ইস, উত্তর পল্লীর দিকটাও ক্রমশ ঘিঞ্জি হয়ে উঠছে পুর্বপল্লির মতোই। বহু মানুষ বাড়ি করেছে এখন এদিকটায়। এদের কজন শান্তিনিকেতন ভালোবেসে আসে? বেশিরভাগই ছুটি কাটানোর জন্য ও বৈভব প্রকাশের জন্য আবাস তৈরি করে রাখে। সে বেশ কিছু মানুষকে চেনে যারা নিয়মিত ব্যবধানে শান্তিনিকেতনে আসে, কিন্তু আশেপাশে কোথাও যায়না। অথচ শান্তিনিকেতনের আশেপাশে ছড়িয়ে আছে প্রকৃতির এক দুর্নিবার রূপ। গোয়ালপাড়া টপকাতে মনটা জুড়িয়ে গেল। এদিকটায় অনেক ফাঁকা এখনও। কোপাইয়ের কাছাকাছি আসতেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। কোপাই এর ধারে এই সময় কোনও কোনও বাউল বসে গান করতে থাকে। ঘুরতে আসা মানুষেরা দু দণ্ড শুনে যায় সেই গান। খুব উৎসাহীরা একটু আধটু ফরমায়েশও করে। কিন্তু আজ এক বিচিত্র দৃশ্য দেখা গেল। একটা গাছের ছায়ায় বসে এক বাউল গান গাইছে "ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে" আর তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মধ্যবয়সি এক দীর্ঘকায় সুপুরুষ। হাল্কা হলুদ পাঞ্জাবি আর নীল জিন্স পরা ভদ্রলোকটিও তারস্বরে গলা মিলিয়েছেন বাউলের সঙ্গে। তার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে এক কিশোরী, বোধহয় মেয়ে হবে ওনার। হঠাৎ পুরুষটি নাচতে শুরু করলেন গানের তালে, সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। দীর্ঘকায় মানুষটি আপন খেয়ালে গান গেয়েই চলেছেন আর তার সঙ্গে আত্মভোলা হয়ে ঘুরে ঘুরে নাচছেন, বোঝাই যাছে, একেবারে মন থেকে উঠে আসছে তাঁর এই আচরণ, সেখানে কোনও মেকি ব্যাপার নেই। এবার কিশোরীটির হাত ধরে নাচতে শুরু করে দিলেন ভদ্রলোক। ভারী ভালো লাগছে তার। তারই বয়সী হবেন মানুষটি অথচ এখনও কত সরল! দেখলেই বোঝা যায় যথেষ্ট অবস্থাপন্ন, কিন্তু এই মুহূর্তে যেন মাটিতে মিশে রয়েছেন। ভদ্রলোক কি চেনা তাঁর ? আগে কোথাও দেখেছে সে? কার সঙ্গে যেন খুব মিল, কিছতেই মনে পরছেনা। ভাবতে ভাবতে সেতু পেরিয়ে চলে গেল রিক্সাটা।

এই সাঁওতাল গ্রামটি খুবই দরীদ্র। এখানকার কিছু বাচ্ছাও আসে তার কাছে গান, আঁকা শিখতে। একটি বাচ্ছা, নাম দোনাই, খুব অসুস্থ, এবার আসতে পারেনি, তাই তাঁর জন্য কিছু ঔষধ আর ফল নিয়ে এসেছে সে। দোনাই তো দিদিমণিকে দেখে ভারী খুশি হয়ে উঠল। অনপক কথা দোনাইয়ের। সে শুনছে বটে, কিন্তু, তার মন খুঁজে চলেছে সেই সূত্রটাকে যে সুত্রে ঐ ভদ্রলোক খুব পরিচিত মনে হছে তার। হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকের মতো এসে যায় নামটা – এ নীল, নিশ্চয় নীল, নীল সেন। হ্যাঁ, ঐ চেহারার গঠন, ঐ সারল্য, ঐ স্বাভাবিকতা, নিশ্চয় নীল। দ্রুত দোনাইদের বাড়ি থেকে উঠে পড়ে সে। নীলের সঙ্গে

তাকে দেখা করতেই হবে। নীলকে বলতে হবে সেই কথাটা যা গত দেড় যুগে বলা বাকি রয়ে গেছে। রিক্সায় উঠে তাড়াতাড়ি চালানোর নির্দেশ দেয় সে। কোপাই এর কাছে আসতে মনটা অন্ধকার হয়ে যায়। গাছতলাটা ফাঁকা, বাউলও নেই, সেই লোকটাও না। তবু রিক্সা থেকে নেমে পড়ে সে। খুঁজতে থাকে নজর চারিয়ে এদিক ওদিক। না কেউ নেই। সে নিশ্চিত ওটা নীলই ছিল। দেখা হলনা, নীলের সঙ্গে তার দেখা হলনা। দেখা হলে নীলকে বলতো সে যে সে নীলকে আজও ভোলেনি, কোন কারণ নেই তবু। মনটা বিষণ্ণ হয়ে কোপাইয়ের পারে বসায় তাকে। রিক্সাটা দাঁড়িয়ে আছে, থাকুক, এখন উঠতে ইচ্ছা করছেনা তার। এখন শীর্ণ কোপাই এর ধারে বসবে কিছুক্ষণ, কষ্ট ভাগ করবে।

মারুতি ভ্যানটা জি টি রোড টপকে কিছুটা এগোতেই নীল অবাক হয়ে গেল। কি দ্রুত বদলে যাছে আশপাশটা! এখন সকাল সাড়ে দশটা। মিনিট কুড়ি হল একটু লেটে আসা ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস থেকে রানীগঞ্জে নেমেছে সে। সে আর অশোক। স্টেশনেই গাড়িটা অপেক্ষা করছিলো তাদের জন্য। গাড়িতে উঠতে উঠতে নীলের নিজেকে বেশ কেউকেটা মনে হল। সি.এ. পড়তে শুরু করার পর থেকে আর্টিকেলশিপ পিরিয়ডে এই প্রথম বাইরে আসা তার। স্যারেরা যখন বললেন যে তাকে পান্ডবেশ্বর বলে একটা কোলিয়ারি অঞ্চলে যেতে হবে মাসখানেকের জন্য, আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিল প্রায়। বেড়াতে যেতে খুব ভালোবাসে সে। আর কোলিয়ারি অঞ্চল তো তার কাছে এক নতুন জগত। একবার অমিতাভের একটা সিনেমা দেখেছিল সে, কালা পাথর। দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। সেও অমন একটা জায়গায় যাবে, ভেবে ভালো লেগেছিল তার। নীল মনে ভেবেই নিয়েছিল যে একবার খনির নীচে নামতে হবে। দেখে আসতে হবে, কি হয় সত্যি মাটির নীচে। কি ভাবে সভ্যতার জ্বালানি উঠে আসে পৃথিবীর বুকের গভীর থেকে।

বাবা বলেছিলো নাকি তিন রকমের খনি হয়। একরকমের হল ওপেন কাস্ট। মানে সেখানে মাটি খোঁড়বার মতো ভূপৃষ্ঠ খুঁড়লেই কয়লা পাওয়া যেতে থাকে এবং ক্রমশ গভীর খাদ হতে থাকে খননের ফলে। দ্বিতীয় রকমকে বলে ইনক্লাইন মাইনস। মানে যেখানে কয়লা থাকে ভূপৃষ্ঠে কিন্তু তার থাকার ধরণটা একটু যেন হেলে। একটা কোনাকুনি সুরঙ্গ খুঁড়তে খুঁড়তে কয়লার সন্ধান পাওয়া যায়। আর শেষ রকমেরটা হল যাকে বলে খনি। ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঁচশো, ছশো, হাজার, দেড়হাজার ফুট নীচে অবধি গর্ত করে তবে পাওয়া যায় কয়লার সন্ধান। লিফটে করে নেমে যেতে হয় সেই ভূ-গহ্বরে, ওই কালা পাথরের মতো আর কি। নীলের এই তিন নম্বরটাতেই যাবতীয় আগ্রহ। মাটির গভীরে যাবে সে। কোনও কিছুরই বিষয়ে জানতে গেলে তার গভীরে যেতে হয়, নীল ভেবেছিল।

রানিগঞ্জ স্টেশন থেকেই টের পাওয়া গিয়েছিল, এখন গাড়ি যত এগোতে লাগলো, তত প্রকৃতির পরিবর্তনটা টের পেল নীল, জীবনযাত্রার ধরণের। মে মাসের কটকটে রোদ্দুরে যেন ফুটিফাটা হয়ে যাছে প্রকৃতি। চারিদিকটা যেন শুকনো কাঠ হয়ে আছে। মাটির রঙ এখানে কালচে, গাছের পাতার সবুজও ধূলিধূসরিত। বাড়িগুলোয়, দোকানের চালায় কালো কালো ছোপ। মাঝে মাঝেই আগে হয়ে যাওয়া বৃষ্টির জল, মাটি আর কয়লার গুঁড়ো মিলে তৈরি করে রেখেছে ঘন, কালচে কাদা। তার উপর ভারী ভারী ডাম্পার আর লোডারের অনবরত যাতায়াত সে মিশ্রণকে আরও গাঢ় আর বিস্তৃত করে দিয়েছে। মাঝে মাঝেই ঝুড়ি কাঁধে চলে যাছে সারা দেহ কয়লার গুঁড়োয় ভরা কুলি কামিনের দল। নীল বুঝে নিল, এ' রাজত্ব কয়লার, কয়লাই এখানে শেষ কথা বলে। তাকে ঘিরেই আবর্তিত এখানকার অর্থনীতি, রাজনীতি, দুর্নীতিও। স্যারেরা পই পই করে বলে দিয়েছেন হিসাবে কোনও বড় মাপের ভুল ধরতে পারলেও ওখানে কিছু বলনা। চুপচাপ নোট নিয়ে চলে আসবে। মনে রেখো সব সময় মাফিয়ারা নজরে রাখবে তোমাদের। নীল জানে এই সতর্কিকরণের কারণ। কয়েক বছর আগে তাদেরই মতো একটি আর্টিকেল ক্লার্ক বড় মাপের গরমিল ধরে ফেলেছিল, প্রকাশও করে দিয়েছিল কথাটা। পরের দিন তার গলা কাটা দেহটা পাওয়া যায় রেললাইনের ধারে। স্যারেরা ঘটনাটা বলতে অশোক বেজায় ভয় পেয়ে গিয়েছিল। অশোক তার চেয়ে কিছু বড় বয়সে, M.A. পাস করে এই সামান্য চাকরীটা করছে আর খুব চেষ্টা করছে একটা সরকারি চাকরি লাগিয়ে

ফেলবার। নির্বিরোধী, ভালো ছেলে, একটু অলস। খুব ভালো গান গায় ছেলেটি। জানালা থেকে চোখ সরিয়ে অশোকের দিকে তাকাল নীল। ঘুমে অচেতন। অনেক ভোরে উঠে ট্রেনটা ধরতে হয়ছে সোদপুরের অশোককে। বরাদ্দ ঘুমটার এখন হিসাব চুকোচ্ছে সে।

গেস্ট হাউসে পৌঁছতে পৌছতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক লেগে গেল। এখানে প্রকৃতি আরও রুক্ষ। দু দিকেই ধু ধু প্রান্তর। মাঝখান দিয়ে ইয়া চওড়া রাস্তা। মাঝে মাঝে কোয়ার্টার মার্কা কিছু বাড়ি ঘর দেখা যাছে। একটু দূরে একটা ঝকঝকে সাদা মার্বেলের মন্দির। এই পাণ্ডববর্জিত পান্ডবেশ্বরে একটা মাস থাকতে হবে ? একঘেয়ে লেগে যাবেনা তো ? ভাবল নীল। তারপরই তার মনে হল, এইসব পরে ভাবা যাবে, আগে গেস্ট হাউসে গিয়ে একটু ধাতস্থ হওয়াটা এখন সবচেয়ে জরুরি। কিন্তু গেটে ঢোকবার সময় একটা ঘটনা ঘটল। নীলেদের গাড়ি গেটের কাছে পৌঁছে হর্ন বাজাতেই এক বুড়ো মতো দারোয়ান ছুটে এল এবং ড্রাইভারকে কানে কানে কিসব বলতে লাগলো। শুনতে শুনতে ড্রাইভারটি প্রথমে বিস্মিত হল, তারপর মনে হল সে মজা পেয়েছে খুব, তারপরই খুব গম্ভীর ভাবে যেন সব বুঝেছে এমন করে মাথাটা নেড়ে গাড়ি ঘুরিয়ে দিল। নীল অবাক হয়ে গেল। কিছুই বুঝতে পারছেনা সে যে কি হল। কোথায় যাছে প্রশ্নটা করতেই সংক্ষিপ্ত উত্তর এলো "পহেলে আপ অফিস চলিয়ে"।

ঘড়ির দিকে তাকাল নীল। ভোর সওয়া তিনটে। ফাঁকা রাস্তা দিয়ে হু হু করে ছুটে চলেছে নীলদের মারুতি ভ্যান। গতকাল বোধহয় পূর্ণিমা গেছে। আকাশে ইয়া বড় থালার মত জেগে আছে চাঁদ। তার আলো পৃথিবীর বুকে নেমে এসে ভাসিয়ে দিচ্ছে এই কয়লা শহর। গত রাতে বৃষ্টি হয়ে গেছে এক-দু পশলা। একটা মিষ্টি হাওয়া শিরশির করে বইছে সেই সুযোগে। এই হাল্কা কাঁপুনির হাওয়া, চাঁদের অপার্থিব নীল আলো, ঘুমিয়ে থাকা কয়লা শহরের চেহারা, মাঝে মাঝেই দু দিকে ছড়িয়ে থাকা প্রান্তর যেন আবিষ্ট করে দিছে নীলের মন। একমাসের উপর এখানে ছিলো সে। এতদিন পরে বাড়ি ফিরছে এখানকার কাজ শেষ করে। তবু আজ যেন ফিরতে মন চাইছে না তার। নীলের মনে হল, একবার যদি গাড়ি ঘুরিয়ে দেখে আসা যেত পেশীবহুল, সুপুরুষ অজয় নদকে! কিন্তু কে যাবে এমন অচিন অভিযানে তার সঙ্গে? সেই শিঞ্জিনী মেয়েটি থাকলে হয়তো যেত। ওই মেয়েটি অন্যরকম। আকস্মিক ভীষণ করে শিঞ্জিনীকে মনে পড়তে লাগলো তার। কোথায় হারিয়ে গেল মেয়েটি কে জানে! আজ যদি যোগাযোগ থাকত শিঞ্জিনীর সঙ্গে, নীল বলেই দিত তার ভালো লাগার কথা। আসলে, জীবনে কিছু কিছু ঘটনা থাকে, কথা থাকে যা সঠিক সময়ে ঘটানো বা বলা গেলে মানুষের জীবনের রেখাচিত্রটাই অন্যরকম হয়ে যায়। মানুষের জীবনের কিছু বাধ্যবাধকতা মানুষকে কখনো তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলতে বাধ্য করে, বাধ্য করে সে যা নয়, সে যা ইচ্ছা করেনি জীবনে, সেটাকেই ইচ্ছা বলে ভবিতব্য বলে মেনে নিতে। নীলের তো কোনও চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট হওয়ার ইচ্ছা ছিলোনা কোনদিন, তার স্বপ্ন ছিল বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করার, বাংলা সাহিত্যের রত্নভাণ্ডারে যে সব মণিমুক্তা লুকিয়ে আছে, ছড়িয়ে আছে, তার রঙের বিচ্ছুরণে নিজেকে রাঙানোর। কিন্তু সে বিলাসিতা দেখাতে পারেনি নীল। বাবার অসুস্থতা, সংসারের তাগিদ তাকে ঠেলে দিয়েছে এমন এক পথে যে পথে হেঁটে গেলে দ্রুত জাগতিক সাফল্য আয়ত্ব করা যায়। তাই, আজীবন সাহিত্য নিয়ে পড়বার বাসনা পুষে রাখা নীলকে অন্য কিছু পড়তে যেতে হয়। তবু, ভিতরের মানুষটা তো আর মরে যায় না। তাই আজও মায়াবী ভোর রাতে নীলের ইচ্ছা করে অজয় নদের কাছে যেতে, সেই নদ যে শুকনো কাঠের মতো পড়ে থাকতে থাকতেই দুদিনের বর্ষায় হয়ে উঠেছিল তারুন্যে ভরপুর, নীলের বিস্মিত চোখের সামনেই, এক রাতের ব্যবধানেই। আগের সন্ধ্যাতেও বিষণ্ন অজয়কে দেখে গিয়েছিল নীল গেস্ট হাউসে ফেরার সময়। পরের দিন বেলায় অজয়ের চেহারা দেখে সে হতবাক। ডিভিসির ছাড়া জলে এক রাতেই সে হয়ে উঠেছে পরিপূর্ণ যুবক, মাতালের মতো ভাসিয়ে দিয়েছে তার বুকে গড়ে তোলা বোল্ডার বাঁধানো সেতু। কত কি-ই যে এই একমাসে দেখল নীল! সেই যেদিন প্রথম এলো আর গেস্ট হাউসে ঢুকতে গিয়েও ঢুকতে পারলোনা, পড়ে কারণটা জেনে অবাক হয়েছিল সে। আগের রাতে গেস্ট হাউসে এক পার্টি ছিল। সেখানে পদস্থ এক কর্তা নেশার ঘোরে নিজের জামা কাপড় ছেড়ে

ফেলতে থাকেন এবং এক সময়ে উলঙ্গ হয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। পরের দিন সকালে জ্ঞান আসতে লজ্জায় গেস্ট হাউসের সেই ঘরটিতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন যেটায় নীলদের থাকার কথা ছিল। ভদ্রলোকটিকে ঘর থেকে বের করা অবধি নীলদের এরিয়া অফিসেই বসিয়ে রাখা হয়েছিল সেদিন।

তবে এখানে এসে নীলের অদ্ভুত সুন্দর এক অভিজ্ঞতা হয়েছে। সে নেমেছিল একটা খনিতে। সাড়ে পাঁচশো ফুট নীচে সে খনি গহ্বর। লিফটটা যখন ভূগর্ভ ছেড়ে মাটির দিকে যেতে শুরু করল আর চারপাশটা অন্ধকারে ভরে গেল, মুহূর্তের জন্য মনটা শিউরে উঠেছিল নীলের। মনে হয়েছিল, আর যদি কোনোদিন উপরে উঠে আসতে না পারে, আর কোনোদিন যদি দেখতে না পায় মা, বাবার মুখ ? কিন্তু নিচে পৌঁছোতেই যেন সব ভুলে গিয়েছিল সে। আশ্চর্য এক জগত ! মাথায় আলো লাগানো হেলমেট পড়ে যত এগোচ্ছিলো নীলেরা, পিছনে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো একের পর এক মস্ত লোহার দরজা যাতে কোনও বিপদ ঘটলে তা ছড়াতে না পারে। কয়লা, কয়লা আর কয়লা ! মাথার উপরে, পায়ের নিচে, দুদিকের দেওয়ালে খালি মানব সভ্যতার চালিকাশক্তি। কোথাও পথ প্রশস্ত, কোথাও সঙ্কীর্ণ, কোথাও মাথা উঁচু করে হাঁটা যায়, কোথাও আবার হামাগুড়ি। কোনও কোনও জায়গায় তীব্র ঠাণ্ডা হাওয়া, তো কোথাও দরদরিয়ে ঘাম এতো আর্দ্রতা ! ঘণ্টা দেড়েক ছিল নীচে নীলেরা। অসাধারণ ! নীল জীবনে ভুলবেনা এ অভিজ্ঞতা। সে রাতে ঘুমোতে পারেনি নীল। তার মাথায় কেবল ঘুরেই যাচ্ছিলো ওই কৃষ্ণগহ্বর। কত যুগ, কত কাল ধরে সভ্যতার শক্তি সঞ্চিত হয়ে আছে ওই সব খনিগর্ভে। মানুষ উপরে সভ্যতার অগ্রগতি দেখে, দেখে নিজেদের এগিয়ে চলা, ভেবেও দেখেনা যে এতে প্রকৃতির অবদান কতোখানি। মানুষ ভাবে সে মহাশক্তিধর, আসলে ভুলেই যায় যে প্রকৃতির সামনে সে পিঁপড়ের মতো। প্রকৃতি দিচ্ছে, তাই মানুষ আছে। প্রকৃতি যদি কোনোদিন দেওয়া বন্ধ করে দেয়, যদি সর্বংসহা রূপ ছেড়ে রুদ্ররূপ ধরে, দাঁড়াবার জায়গা থাকবেনা মানুষের। আর সভ্যতা তখন নিমেষে ছারখার হয়ে যাবে। একটা সামুদ্রিক ঝড়, একটা ভূমিকম্প, মানুষের সব অহঙ্কার এক মুহূর্তে ধূলিসাৎ করে দিতে পারে। প্রকৃতি, সময়, এসবের সামনে মানুষ অসহায়, আগেও অসহায় ছিল, চিরকালই থাকবে।

হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়িটা দাঁড়িয়ে যেতে সম্বিত ফিরল নীলের। স্টেশন এসে গেছে। ছ'টার বিধান এক্সপ্রেসে ফিরবে তাঁরা। এই কয়লা শহর ছেড়ে আবার ফিরে যাবে চিরপরিচিত মহানগরে। মিশে যাবে সেখানকার কর্মজীবনের সঙ্গে। বয়ে যাবে সময়। শুধু নীলের মনে চিরকালের মতো জলছবি হয়ে রয়ে যাবে এখানকার অভিনব অভিজ্ঞতা।

(চলবে)

সৌমিত্র চক্রবর্তী — পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার 'খেলার ছলে' পত্রিকার মূল কান্ডারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই 'দেশ', শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে।

ধারাবাহিক

শকুন্তলা চৌধুরী

পরবাসী

পর্ব ৬

(৭)

সাম্য বড় হচ্ছে – শীর্ষ তার সঙ্গে এখন অনেকটা সময় কাটান। যে বাবাকে বহু বছর হাসতে দেখেনি বাপ্পা, তিনি সাম্যর কথায় হঠাৎ হঠাৎ অট্টহাস্য করে ওঠেন। বাপ্পা আর আহেলী নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও, weekend এ এক একদিন চারজনে মিলে কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসে গাড়ী নিয়ে। রীতি ততদিনে ব্যাঙ্গালোরে settle করে গেছে। মাঝারি মাপের একটি IT Company তে কাজ করছে। বিয়ে করবেনা বলে দিয়েছে তবে একটি South Indian বয়ফ্রেণ্ড আছে, তার সঙ্গে একবাড়ীতেই থাকে রীতি।

এই নিয়েও শীর্ষর অনেক অশান্তি গেছে। শেষে বাপ্পাই বাবাকে বুঝিয়েছে। দিনকাল পাল্টাচ্ছে, রীতি যদি সেই তালে পা ফেলে চলতে চায় তাহলে তর্ক করে তো লাভ নেই! রীতি আনন্দে থাকলেই হলো। অনেক বোঝানোর পর শেষে একটু ঠাণ্ডা হলেন শীর্ষ। সবার পীড়াপীড়িতে, retirement নেওয়ার কিছুদিন পরে ব্যাঙ্গালোরে রীতির বাড়ীতে গিয়ে মাস দুয়েক কাটিয়েও এলেন। সে আরেক অভিজ্ঞতা!

রীতির বলিষ্ঠ, আত্মনির্ভর, নতুন রকমের জীবনধারা দেখে শীর্ষ খুশী হবেন না অবাক হবেন, ভেবে পেলেন না। ছোট্ট এক বেডরুমের ফ্ল্যাট – তার ভাড়াই অনেক ব্যাঙ্গালোরে। বাইরের ঘরের একদিকে একটা ছোট্ট দরজা-দেওয়া স্টাডি। স্টাডিতে একটা সোফা-কাম-বেড পাতা, সেখানেই শীর্ষর শোওয়ার ব্যবস্থা।

রীতির আগে ঘুম থেকে ওঠে রবি। সে-ই শীর্ষর জন্যে টেবিলে ব্রেকফাস্টের জিনিস গুছিয়ে দেয়। রীতি চিরকালই late-riser, সেই অভ্যাস সে এখনো পাল্টায়নি – বাবা এসেছেন বলেও না। রীতি অতিকষ্টে আটটা-সওয়া আটটায় ঘুমের থেকে উঠে ঝড়ের বেগে বাথরুমে ঢুকে, কোনোরকমে রেডি হয়ে, হাতে একটা ব্রেকফাস্ট বার নিয়ে বাবাকে "Bye" বলে ছুট লাগায়। রবিও বেরিয়ে যায়। ওরা ফেরে সেই রাতে। লাঞ্চটা শীর্ষ একাই সারেন, ফ্রিজ থেকে খাবার বার করে মাইক্রোওয়েভে গরম করে নেন। খাবারও বেশীরভাগই কেনা, Chinese takeout বা পিৎজা। ক্বচিৎ কদাচিৎ রবির হাতে বানানো weekend-এর leftover উপমা বা ইডলি। ইডলিটা শীর্ষ আগে একেবারেই খেতেন না, এখন খেতে খেতে অভ্যাস হয়ে গেছে।

Weekend-এ একটু আধটু রান্না হয় রীতির বাড়ীতে, যদি না কোনো পার্টি থাকে। তবে রান্নাটা রবিই করে। ঝাল-ঝাল দক্ষিণী স্টাইলে রাঁধা মাংস বা তরকারী। সঙ্গে সম্বর এবং টকদই। শীর্ষর মুখে একটু অন্যরকম লাগে, রীতি দিব্যি খেয়ে নেয়। ওকে দেখলে মনেই হয়না যে এই মেয়ে প্রতি রবিবার লুচি খাওয়ার জন্য বায়না করতো আর মাঝে মাঝেই "এখুনি চিংড়ির মালাইকারী চাই" বলে চীৎকার জুড়তো। শীর্ষ একদিন হাসতে হাসতে জিগেস করলেন – "তোমার আর ঐসব খেতে ইচ্ছে করে না ? লুচি, মালাইকারী, মালপোয়া, পিঠে ....."

রীতি বললো – "খাই তো, কলকাতা গেলে। এখানকার বাঙালী রেস্টুরেন্টগুলো ওসব পারেনা – নিয়ে যাবো তোমায় একদিন। .... আর আমি ঐসব রান্না-ফান্না করে খেতে পারবো না, রান্না করতে আমার ভালোই লাগে না ! Much better যে রবি cook করবে আর আমি খাবো – যাই রাঁধুক, আমি "fantastic" বলে খেয়ে নেই।"

"রান্না করতে আমার ভালোই লাগে না" – শুনে কি কিছু মনে পড়লো শীর্ষর ? একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন, মুখে কিছু বললেন না।

রীতির ফিরতে প্রায়ই রাত হয়, রবিরও মাঝে মাঝেই দেরী হয় – তবু রাতের খাওয়াটা ওদের সঙ্গেই করেন শীর্ষ। সেদিনও অপেক্ষায় ছিলেন, টিভি দেখছিলেন বসে। রাত ৯টা বেজে যাওয়ার পর একটু চিন্তিত হয়ে উঠলেন – শুক্রবার তো রীতির এত দেরী হওয়ার কথা না, সাধারণত America তে weekend শুরু হলে ব্যাঙ্গালোরের IT company গুলোও তাড়াতাড়ি wrap up করে ..... তাহলে? রবিকে জিজ্ঞেস করতে, ও খুব ঠাণ্ডাভাবে বললো যে রীতি ওর বন্ধুদের সঙ্গে pub-এ chill করছে।

রীতি বন্ধুদের সঙ্গে .... pub এ chill করছে .... রবি বাড়ীতে computer নিয়ে .....স্বভাববশত শীর্ষ একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। কিন্তু রবির মুখ দেখে মনে হলো না এই নিয়ে আলোচনা করার কিছু আছে। সুতরাং শীর্ষ চুপ করে গেলেন। রীতি ফিরলো প্রায় দশটায়। এসেই বললো – "I'm too tired guys....please go ahead and have dinner without me. I had some appetizers there. Just going to take a shower now and go to bed."

রবি চুপচাপ উঠে ফ্রিজ থেকে গতকালের আনা চাইনিজ বার করে মাইক্রোওয়েভে দিয়ে দিলো। দু'জনের তুলনায় অনেকটাই ফ্রায়েডরাইস আর চিলি চিকেন বেঁচেছে – হয়ে যাবে। রবি কথা কম বলে। টিভি দেখতে দেখতে দু'জনে খাওয়া শেষ করলেন। রবি সব পরিষ্কার করে আবার গিয়ে computer-এ বসলো, শীর্ষ শুতে চলে গেলেন।

পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে দেখা হলো রীতির সঙ্গে। বোধহয় কালকে বাবাকে ডিনারে সঙ্গ না দেওয়ায় একটু guilty feel করছে। খুব গল্প জুড়লো। চুল ঝাঁকিয়ে বললো – "Let's go to the Bengali restaurant tonight Baba — what say, Ravi?" রবির আর আপত্তি কিসের – ও বাঙালী খাবার ভালোই বাসে। সুতরাং তাই ঠিক হলো।

রবি স্নানে ঢুকলে, শীর্ষ আস্তে করে বললেন – "কাল তোমার অতো রাত হলো .... রবি একা বাড়ীতে ..."

রীতি বাবার উদ্বেগ এক তুড়িতে উড়িয়ে দিলো – "ও জানে .... I need this relaxation time with my friends once in a while বাবা ..... কাজের এত stress না! সবারই নিজস্ব জায়গা দরকার to unwind .... আর, একা কই? তুমি তো ছিলে!"

শীর্ষ তবু খুঁতখুঁত করেন – "রবিকে নিয়ে গেলে পারতে!" রীতি অবাক – "What was he supposed to do there? এরা আমার বন্ধু বাবা, আমার! আমরা একসঙ্গে থাকি বলে কি আমাদের সব বন্ধুও এক হতে হবে নাকি? .... Bed share করছি বলে কি toothbrush share করবো? না! ঠিক তেমনি, বন্ধুও সবসময় share করা যায় না – না করাই ভালো।" শীর্ষ বললেন – "ওরও তো unwind করার দরকার আছে – তাই না? সারাদিন কাজ করে, রান্নাও করে ..."

রীতি এবার চোখ তুলে বললো – "ঝড়? এর উল্টোটা হলে, মানে বাড়ীর বৌ সারাদিন সব কাজ করছে রান্না করছে without a break, তখন কি তোমার মনে হতো যে বৌ-এর unwind করা দরকার? Our women deserve better, Baba..they do not get the support from the society like the women in western countries get..yet they achieve so much..even the family does not support them.."

শীর্ষ হঠাৎ চমকে মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন – ও কি রীতি, না .... ? রীতির সেদিকে খেয়াল নেই। ও একনিঃশ্বাসে বলে যাচ্ছে – "এগুলো সব society-র বানানো নিয়ম, মান্ধাতার আমল থেকে চলে আসছে ..... does not mean those are right, বাবা ! রবির break দরকার হলে ও যাবে, ওর বন্ধুদের সাথে .... no one is stopping him! কিন্তু আমার relaxation should not depend on him – দুটো totally আলাদা। .... আর South Indian ছেলেরা খুব কাজের হয় বাবা, কাজ করাটা ওর কাছে কোনো issue নয়। In fact বাঙালী ছাড়া আর সব ছেলেরাই ঘরের কাজ করে ..... বাঙালী ছেলেরাই শুধু মায়ের খোকা!"

আবার একটা ধাক্কা খেলেন শীর্ষ, মনে মনে।

তবু সব মিলিয়ে সময়টা শীর্ষর ভালোই কাটছিলো রীতির বাড়ীতে। কলকাতায় যেমন সাম্যর জন্য বাড়ী সরগরম, এখানে তেমন নয়। নিজেকে নিয়ে, নিজের ভাবনা নিয়ে তাই অনেকটা সময় কাটাচ্ছেন শীর্ষ আর অন্যরূপের এই রীতিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। রীতিকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করার সময়টা পার হয়ে গেছে বলে বোধহয় ওকে বোঝার চেষ্টাটাই গুরুত্ব পাচ্ছে বেশী মনের ভেতর – সময়ও হাতে অনেক। দিনের বেলা নিজে একটু হাঁটাহাঁটি করেন, computer-এ বসেন। রীতি বাড়ী এলে ওর সঙ্গে গল্প করেন। তিনজনে মিলে টিভি দেখেন। Weekend-এ এদিক ওদিক বেড়াতে নিয়ে যায় রীতি। একটা weekend দেখে উটি গেলেন সবাই মিলে, রবি আর রীতি শুক্রবারটা ছুটি নিলো। খুব সুন্দর ঘোরা হোলো। জায়গাটা ছবির মতো। রীতি বললো অনেক হিন্দি ছবির শ্যুটিং হয় নাকি এখানে। ওরা মাঝে মাঝেই এখানে আসে, দু'তিন দিনের ছোটো কোনো ছুটি থাকলে। লেক আর পাহাড় একসঙ্গে মিলে একটা অপূর্ব শোভা তৈরী করেছে জায়গাটার। এখনকার নতুন রিসর্টগুলোও খুবই সুন্দর ভাবে বানানো। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও ভালো।

সব মিলিয়ে বেশ ভালো লাগলো শীর্ষর। রীতি আর বাপ্পা যখন ছোটো ছিলো, দিনগুলো তখন যুদ্ধ করতে করতেই কেটে গেছে – ওদের কোথাও বেড়াতে নিয়ে গেছেন বলে মনে পড়ে না। বাপ্পা সেই একবার দিল্লী-আগ্রা-জয়পুর গেছিলো ... ও এতো ছোটো ছিলো যে নিশ্চয়ই মনেই নেই। তারপর শুধু zoo, planetarium, Victoria Memorial.....এর বাইরে তো আর কোথাও যাওয়া হয়নি। রীতির ভাগে প্রায় শুণ্য! মনের মধ্যে অপরাধবোধের সঙ্গে সঙ্গে একটু আরামবোধও হলো এটা জেনে যে ওরা নিজেরা আজকে সেই ঘাটতিটা পূরণ করে নিতে সক্ষম এবং করে নিচ্ছেও!

এক রবিবারে ফিরলেন উটি থেকে, তার পরের শনিবার রীতিদের বাড়ীতে পার্টি। শীর্ষ শুনলেন "food is on Riti and drinks on Ravi" ... অবাক হতে হতে নিজেকে সামলে নিলেন শীর্ষ। মনে পড়লো রীতির কথা – সবকিছুই একসাথে হবে তার কোনো মানে নেই। ওদের নিশ্চয়ই joint bank account নয়। বিশেষত, ওরা যখন বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়নি। অর্থাৎ ওদের সংসার চলে কতগুলো নিয়মে, কতগুলো financial arrangement-এ। একটা চুক্তির মতো - এ' এটা করবে আর সে ওটা করবে। তবে বিয়ের মতো কাগজে সই করা বা সাতপাকে বাঁধা চুক্তি নয়, তাই যখন খুশী যে কেউ চুক্তি না মেনে বেরিয়ে যেতে পারে .... রীতির ভাষায় "without much drama" ..... তার জন্যও এরা তৈরী। সম্পর্ক ভেঙে গেলেও এরা এগিয়ে চলে – "move on" is the motto ..... ভাবতে অবাক লাগে যে এটা পাশ্চাত্য নয়, ভারতবর্ষ। সত্যি, এক জেনারেশনে পৃথিবীটা কতো পাল্টে গেলো!

রবির বন্ধু, রীতির বন্ধু, দুজনের colleagues – সব মিলিয়ে প্রায় ৭/৮ জন এলো। কিছু couples, single-ও আছে কয়েকজন। রীতি শীর্ষকে সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো। "হাই-হ্যালো" চললো কিছুক্ষণ। তারপর সবাই যে যার মতো গল্প শুরু করলো। শীর্ষ লক্ষ্য করলেন যে শীর্ষর উপস্থিতি নিয়ে কেউ অতিরিক্ত conscious নয়। বিনা সঙ্কোচে, drinks এর গ্লাস হাতে নিয়ে, ছেলে মেয়ে সবাই নানাধরণের আলোচনায় মেতে গেলো – যেন সবাই সবার চেনা, সমবয়সী বন্ধু, এমনকি শীর্ষও! কলকাতায় বাপ্পা-আহেলীদের বন্ধুদের মধ্যে এটা এখনো ততটা দেখেননি, যতটা ব্যাঙ্গালোরে দেখলেন – হয়তো বেশী cosmopolitan বলে, বা হয়তো West-এর সঙ্গে continuously connected IT crowd বলে! "We just broke up....he was not my type! I am dating someone else now, let's see!" শীর্ষ শুনলেন রীতিরই এক colleague বলছে আরেকজনকে। বলছে অনায়াসে, নির্দ্বিধায়। শীর্ষর সামনেই। এর ভেতরে লুকোনোর বা লজ্জা পাওয়ার মতো কিছু আছে বলে এরা ভাবেই না। সবাই স্বাধীন – ভালো না লাগলে সম্পর্কের বাঁধনে বাঁধা থাকবে না, নতুন সাথী খুঁজে নেবে !

এই বেরিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতাটাই কি তবে এই যুগের সম্পর্কের চাবিকাঠি ? "আমি স্বাধীন" – এই বোধটাই কি এদের সেই গ্লানি থেকে বাঁচায়, যে গ্লানি কখনো কখনো উইপোকার মতো ভেতর থেকে কুড়ে কুড়ে খেয়ে দাম্পত্যজীবনের ভিতটাই নষ্ট করে দেয়?! এদের দেখেই শীর্ষ বুঝলেন যে এদের জীবনে সমাজ কোনোভাবে চাপ তৈরী করতে পারেনি, এরা

কোনো baggage পিঠে নিয়ে চলে না। তাই হয়তো রীতির স্বাধীনচেতা মনের সঙ্গে এদের মেলে ভালো! অনেক কিছু দেখলেন আর শুনলেন শীর্ষ, যা মনের গভীরে দাগ কেটে গেলো। সত্যিই বোধহয় জীবনে শেখার কোনো শেষ নেই – ভাগ্যিস এসেছিলেন রীতির বাড়ী!

সাম্যকে ছেড়ে থাকতে পারেন না বলে শীর্ষ আর বেশীদিন থাকলেন না। পুজোর আগে এসেছেন, প্রায় দু'মাস হতে চললো। রীতি বলেছিলো – "আসছোই যখন, তখন এবারে ব্যাঙ্গালোরের পুজো দেখো।" সেইমতো টিকিট কেটে মহালয়ার তিনদিন বাদেই চলে এসেছিলেন। ফলে বহুবছর বাদে কলকাতার বাইরে পুজো কাটালেন। আর একবার বোধহয় দিল্লীর পুজো দেখেছিলেন, বাপ্পা তখন বছরখানেকের। শুচির পীড়াপীড়িতে ছুটির সময় দিল্লী-আগ্রা-জয়পুর যাওয়ার প্ল্যান করেছিলেন। ..... ঐ একবারই! মা এতো অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে তারপর থেকে প্রতি পুজোয় ষষ্ঠীর দিন থেকে লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত ছুটির দিনগুলো কাটতো কল্যাণীর বাড়ীতে। ..... সেবারে দিল্লীর পুজোও ভালো লেগেছিলো, এবারে ব্যাঙ্গালোরের পুজোও ভালো লাগলো। কলকাতার মতো আড়ম্বর নেই, কল্যাণীর মতো পাড়া-প্রতিবেশীর ভিড় নেই, শুধু কয়েকটি বাঙালী পরিবার মিলে আন্তরিকতার সঙ্গে মা দুর্গার আবাহন। তার সঙ্গে পরিপাটি খাওয়ার আয়োজন আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ফেরার ঠিক আগে, চারদিনের জন্যে সবাই পণ্ডিচেরী ঘুরতে গেলেন। বেশ লাগলো সমুদ্রের ধারের ছিমছাম জায়গাটা – ফরাসী উপনিবেশের ছাপ এখনো স্পষ্ট। সমুদ্র তো ভালো লাগলোই, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমও খুব ভালো লাগলো শীর্ষর। শুনলেন ২৪ নভেম্বরের দর্শনে খুব ভিড় হয়েছিলো। কিছু দর্শনার্থী এবং ট্যুরিস্ট এখনো রয়ে গেছেন – তাদের দেখলেই আলাদা করে চেনা যায়।

আধ্যাত্মিকতা কোনদিনই শীর্ষর মনের ঠিক ভেতরে প্রবেশ করতে পারেনি। আগে মা যা বলতেন সেইভাবে যতটুকু করার করতো – পৈতে, লক্ষ্মীপুজো সবই তাই! শুচি চলে যাওয়ার পর থেকে একটু একটু করে কমতে কমতে, মা চলে যাওয়ার পর একেবারে সবই বাদ হয়ে গেছে। ইদানীং দুর্গাপুজোতে শুধু একদিন বাপ্পাদের সঙ্গে গাড়ী করে বেরোন। তবে এখন বাঙালীর দুর্গাপুজোতে পুজো কম, উৎসব বেশী – একটা সামাজিক ritual হিসাবেই সেটা পালন করে যাচ্ছেন এখন অবধি। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এর বাইরে কখনো কোনো আধ্যাত্মিকতা শীর্ষর বাঙালী ইন্টেলেকচুয়ালিজম-এর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে পারেনি।

সেইরকম মন নিয়েই পণ্ডিচেরীতে সমাধির পাশে এসে বসেছিলেন। তবে বসার পর একটা অন্যরকম অনুভূতি বোধ করলেন। কী অনুভূতি, সেটা ঠিক নিজেও বুঝলেন না। শুধু মনে হলো, এই প্রথম কিসের যেন একটা ঠাণ্ডা প্রলেপ পড়লো দীর্ঘদিনের রোদে-পুড়ে-যাওয়া জীবনে।

লক্ষ্য করলেন যে রীতি না হলেও, রবি বেশ seriously meditation করছে। এইদিক দিয়েও বোধহয় অন্য সব প্রদেশের ছেলেদের সঙ্গে বাঙালীদের বিরাট তফাত। বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পুরুষ সম্প্রদায় একটা উন্নাসিক উদাসীনতায় "পুজো" এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারকে অন্দরমহলে ঠেলে রেখেছে – যেন তাতে বেশী involved হয়ে গেলে পুরুষত্ব কমে যাবে! অবাঙালী পুরুষকূল কিন্তু অন্যরকম। ধার্মিকই বলো আর equality-তে বিশ্বাসীই বলো – নবরাত্রির উপোস থেকে গণেশপুজোর মন্ত্রোচ্চারণ, সবেতেই অবাঙালী ছেলেরা রয়েছে মেয়েদের পাশাপাশি। তাতে তাদের পুরুষত্বহানি হয়েছে বলে তো মনে হয় না। .... শীর্ষও meditation করার চেষ্টা করলেন। অনভ্যাসের প্রথম চেষ্টা – খুব যে এগোলেন তা মনে হলো না, কিন্তু মনে কেমন একটা প্রশান্তি অনুভব করলেন। সেই রেশটা রয়ে গেলো ক'দিন।

সবই দেখা হলো, এবার ফেরার পালা – সাম্য তাগাদা দিচ্ছে, ওর স্কুলে ডিসেম্বরের ছুটি পড়লো বলে। শীতে কলকাতার আবহাওয়াও ভালো থাকে – একটু ঘোরাঘুরি হয় সবাই মিলে। সেটা শীর্ষরও ভালোই লাগে। আবার আসবেন – রীতিকে এই কথা দিয়ে, শীর্ষ কলকাতায় ফেরার জন্য তৈরী হলেন। অবসরপ্রাপ্ত জীবনে তাঁর সময় কাটে এখন সাম্যকে

নিয়ে। দু'মাসই মনে হচ্ছিলো খুব লম্বা। নাতিও খুব খুশী দাদু ফিরে আসছে বলে – কাজের দিদি গৌরীর সঙ্গে সাম্যর একদম বনে না, দাদুকে লাগেই ঝামেলা মেটাতে।

বাপ্পা নিজেই গেলো বাবাকে airport-এ receive করতে। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, ফ্লাইট সময়েই এসেছে। বাবার হাসিমুখ দেখে মনে হচ্ছে যাওয়ার সময় যতটা নেতিবাচক ছিলেন, এখন ঠিক ততটা নন। গাড়ীতে উঠে বাপ্পা বাবাকে বললো – "কেমন ঘুরলে, বলো!"

শীর্ষ হেসে বললেন – "ভালোই। .... দুটো weekend বাইরে ঘুরতে গিয়েছিলাম, এছাড়া বাড়ীতেই ছিলাম – রীতির সঙ্গে অনেকটা সময় কাটাতে পারলাম।"

বাপ্পা বললো – "তবে দ্যাখো! শুধু শুধু যেতে আপত্তি করছিলে।"

ভি.আই.পি. রোড দিয়ে গাড়ী ছুটছে। শীর্ষ অন্যমনস্কভাবে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন – "হয়তো আমি ভুল বুঝতাম .... বা বোঝার চেষ্টাই করিনি কখনো। .... একেকজন একেকভাবে জীবনকে দেখে, উপভোগ করতে চায় .... দোষ দেওয়া যায় না। সবাই তো আর এক ছাঁচে তৈরী হয়নি। ..... তবু দেখো, সেটা বুঝতে কতদিন লেগে যায়!"

বাপ্পা হেসে বললো – "রীতি একটু জেদী, কিন্তু তোমায় খুব ভালবাসে। ... আমাকে মেসেজ পাঠিয়েছে যে তোমাকে already miss করছে। অফিস থেকে তোমায় বাড়ীতে বারবার ফোন করতো, বাড়ী এলে তুমি দরজা খুলতে!"

শীর্ষ বললেন – "আবার যাবো'খন সামনের বছরে। .... এখন বলো তোমাদের খবর, সাম্য কি বলে?"বাপ্পা বললো – "খুব excited তো, তুমি আসছো বলে! কিসব বানিয়ে রেখেছে তোমার জন্যে – স্কুলে project-এ শিখেছে।"

শীর্ষ ফিরে আসার ক'দিন পরেই সাম্যর Christmas vacation শুরু। আহেলীরও স্কুল ছুটি। বাপ্পা ঠিক করলো যে ও ক'দিন ছুটি নেবে। মুকুটমণিপুরে booking করে ফেললো – বাবাকে নিয়ে কদিন সবাই একসঙ্গে কাটাবে। সব ঠিকঠাক, packing হয়ে গেছে – যাওয়ার আগের দিন রাত্রে শীর্ষর massive heart attack হলো। বাথরুম যেতে গিয়ে দরজার সামনে পড়ে গিয়েছিলেন। শব্দ শুনে বসার ঘর থেকে গৌরী ছুটে এলো, তার চিৎকারে ঘুম ভাঙলো বাপ্পা আর আহেলীর। এসে দেখে বাবা মাটিতে শোয়া – যেন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন। চিকিৎসা করার এতটুকু সুযোগ না দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেলেন সদ্য ৫৯-এ পা দেওয়া শীর্ষ ব্যানার্জী। গৌরীকে সাম্যর ঘরে শুতে পাঠিয়ে, আহেলী এসে বাপ্পার হাত ধরলো।

(৮)

ব্যাঙ্গালোর শহরটা দিন দিন congested হয়ে যাচ্ছে। যাতায়াত করতেই দিনের আর্দ্ধেক সময় বেরিয়ে যায়। সামনে দাঁড়ানো সার সার গাড়ীর দিকে তাকিয়ে বিরক্তিতে মুখ কোঁচকালো রীতি।

শোভার বাড়ীতে পার্টি, সাতটায় শুরু হওয়ার কথা। আটটার আগে পৌঁছতে পারবে বলে মনে হয় না।

শোভা রীতির soul-mate, প্রাণের বন্ধু যাকে বলে।

ব্যাঙ্গালোরে প্রথম যে কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে এসেছিলো রীতি, সেখানেই কাজ করতো শোভনা আয়েঙ্গার। চাকরিতে বছরখানেকের সিনিয়র শোভা রীতিকে শুধু কাজই শেখায়নি, হাতে ধরে জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিসও শিখিয়েছে। সেই থেকে বন্ধুত্ব।

শোভার জন্যই সম্পূর্ণ অচেনা এক শহরে প্রথম এসে রীতি কখনো একা মনে করেনি নিজেকে।

সপ্তাহান্তে নিজের ওয়ার্কিং গার্লস হস্টেল থেকে শোভার ছোট্ট ফ্ল্যাটে গিয়ে ইডলি খাওয়া থেকে শুরু করে, শুক্রবার রাতে একসঙ্গে দক্ষিণী মুভি দেখতে যাওয়া ..... সবেতে শোভার সঙ্গে রীতি।

শোভাই রীতিকে শিখিয়েছিলো যে অচেনা শহরে নিজেকে অভ্যস্ত করানোর প্রথম তিনটি পথ হলো ভাষা, খাবার এবং পথ। যেখানে থাকছো সেখানকার ভাষা রপ্ত করো, তাদের খাবার খাও আর সেই শহরের অলি-গলিতে ঘুরে বেড়াও ..... সেই শহরের আত্মাকে অনুভব করো।

মাদ্রাজ শহরে জন্মানো, মা-বাবার একমাত্র সন্তান শোভার কলেজের শিক্ষা দিল্লিতে।

প্রায় জোর করেই নিজের চেনা গণ্ডীর বাইরে গিয়ে নিজেকে চ্যালেঞ্জ করেছিলো শোভা।

দক্ষিণী এ্যাকসেন্টে বলা ইংরেজী নিয়ে চাপা বিদ্রূপ শুনেছে আর গুণে গুণে মাসে চার থেকে পাঁচটা হিন্দী সিনেমা দেখে হিন্দী শিখেছে।

ইডলি-সম্বর-ধোসায় অভ্যস্ত জিভকে বাধ্য করেছে মটর-পনির, চানা-বাটোরা আর বেগুন-ভর্তা খেতে।

কোঁচকানো লম্বা চুলের বিনুনী কেটে করেছে কাঁধ-ছোঁওয়া স্টেপকাট।

আর, পাঁচবছরে চিনে নিয়েছে দিল্লীর অলিগলি।.....

এখন পুরো নাম না জানলে বোঝাই যাবে না যে শোভা কোথাকার মেয়ে।

শোভার কথা অনুযায়ী – "গা থেকে তোমার স্টেটের আঁশটে গন্ধটা উঠিয়ে ফেলো, ভারতীয় হও – দেখবে রাস্তা মসৃণ হয়ে গেছে।"

সেই মসৃণ রাস্তা ধরে শোভা কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাঙ্গালোরের বড়ো একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির IT ম্যানেজার হয়ে গেলো। চাকরি বদলালেও, রীতির সঙ্গে বন্ধুত্বে ছেদ পড়লো না।

কলকাতা ছেড়ে আসা রীতি তখন নতুন কূলের সন্ধানে ব্যাকুল। প্রায় আক্ষরিক অর্থেই সে শোভার কথা মেনে চলতে শুরু করলো।

সমস্ত বাঙালী উন্নাসিকতা ত্যাগ করে, দক্ষিণী ভাষা শেখার চেষ্টায় লাগলো।

যতই মনে হোক না কেন যে "সেদ্ধভাতের দলা খাচ্ছি", প্রতি weekend-এ ইডলি-সম্বর দিয়ে lunch করতে শুরু করলো।

প্রতি রবিবার সে নিজেই নিজের গাইড হয়ে ব্যাঙ্গালোর দেখতে বেরিয়ে পড়লো, এবং কয়েক মাসের মধ্যেই শহরটাকে ভালোবেসে ফেললো।

এই করতে করতে কবে যেন কসমোপলিটান ব্যাঙ্গালোরের দক্ষিণী জীবন যাত্রায় আদ্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে উঠলো রীতি।

বছর দুয়েকের মধ্যে সেও অনেক বেশী মাইনেতে আরেকটি কোম্পানীতে চাকরি নিলো আর মনে মনে বললো – "কলকাতায় আর ফিরছি না।"

সত্যি বলতে কি, অন্যের জীবনে উঁকি-মারা অতিমাত্রায় গা-ঘেঁষা বাঙালী জীবনে রীতির বহুদিনের বিতৃষ্ণা।

তার চেয়ে এই কর্মব্যস্ত শহর, যেখানে সবাই শুধু রীতিকে চেনে কিন্তু তার অতীতকে নয়, যেখানে সবাই গতিময় তাই 'স্থিতু হতেই হবে' বলে কেউ চাপ দ্যায় না, যেখানে রবি আর রীতি ভাষার দূরত্বের আড়ালে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে 'লিভিং টুগেদার' করতে পারবে – এই-ই ভালো।

রীতি তখন ভাইজ্যাগের ছেলে রবি রেড্ডির সঙ্গে ডেট করছে – বাবা জানেনা, কিন্তু দাদাভাই কিছুটা জানে।

রবির সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছিলো একটা পাবে – রীতির এক কলিগের বন্ধুর বন্ধু ও। রীতি কলিগদের সঙ্গে যে পাবে গিয়েছিলো, রবিরাও ছিলো সেখানে।

রীতিকে দেখে আলাপ হওয়ার আগেই রবি বলে উঠলো – "You must be a Bengalee?!"

"Why are you saying so?" রীতি বেশ অবাক, এবং খানিকটা বিরক্তও। গায়ের থেকে নিজের স্টেটের গন্ধ সম্পূর্ণভাবে তুলে ফেলেছে বলেই ওর বিশ্বাস ..... তাহলে এ' প্রশ্ন কেন!

রবি বললো – "Your eyes ..... Bengalee girls have unique eyes and a sweet voice that stand them apart from all other Indian girls."

"Really?" একটু অপ্রস্তুত ভাবে হাসলো রীতি।

ততক্ষণে দলের বাকীরা রবির পেছনে লাগতে শুরু করেছে – "What are you waiting for then, Ravi? ..."

রবি বেশী কথা বলে না, তাই ঠাট্টার উত্তরে শুধু হাসলো।

জানা গেলো যে রবির পূর্ববর্তী বান্ধবী ছিলো বাঙালী, ওরা একই শহরে বড়ো হয়েছে। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, সেই সম্পর্ক বেশীদূর গড়ায়নি। মেয়েটি একটি বাঙালী ডাক্তার ছেলেকে বিয়ে করে বিদেশে পাড়ি দ্যায় এবং রবি চাকরি নিয়ে ব্যাঙ্গালোরে চলে আসে।

রবির মনে বাঙালী প্রেম গভীর ছিলো বলেই হোক, বা রীতির উচ্ছল স্বভাব তার নিজের স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত বলেই হোক, রবি রীতির সঙ্গে প্রায়ই চ্যাট করতে লাগলো।

ধীরে ধীরে কিছু যেন একটা গড়ে উঠলো, যেটা পুরো বোঝার আগেই তার স্রোতে গা ভাসালো রীতি।

সেদিনও দুজনে মুভি দেখতে গিয়েছিলো। তারপর ডিনারে যাওয়ার কথা।

কিন্তু মুভি শেষে বেরিয়ে রীতি বললো যে ওকে একজায়গায় ফ্ল্যাট দেখতে যেতে হবে, এই ফ্ল্যাটটা ওকে সামনের মাসেই ছেড়ে দিতে হবে – তাই ....

রবি একটু চুপ করে থেকে বললো – "Why don't you move into my flat with me?"

রীতি বললো – "মানে ?"

রবি বললো – "মানে is simple.....will you marry me?"

রীতি গম্ভীর হয়ে গেলো। চুপচাপ হেঁটে গেলো পাঁচ মিনিট, কোনো কথা না বলে।

রবি ওর মুখ দেখে ভয় পেয়ে বললো – "Did I say anything wrong? Sorry if I misunderstood your feeling....."

রীতি এবার ঘুরে তাকালো।

হাসতে হাসতে বললো – "No, you did not misunderstand anything. Thank you, by the way, for the offer. I do not mind moving in with you but I do not believe in that institution called 'marriage'. Now you tell me, is your offer still on?"

রবি একটু হাসলো, তারপর বললো – "Yes, it is still on."

রীতি নাটকীয়ভাবে হাত তুলে রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে হেসে বললো – "Let's move forward then, on equal footing and no bondage! Both of us will respect each other's privacy and live as partners. We are free to walk out anytime we feel like.....agreed?"

রবি বললো – "Absolutely!"

সেই শুরু হলো রীতির যৌথ জীবন, ছাব্বিশে পা দিয়ে। "পথ বেঁধে দিলো বন্ধনহীন গ্রন্থি।"

দাদাভাই শুনে খুশী হলো, কিন্তু এ-ও বললো যে "বাবা মানবে না, দুঃখ পাবে।"

রীতি বললো – "তাহলে বাবাকে বোলো না!"

বাপ্পা বললো – "লুকোনোটা ঠিক হবে না।"

রীতি অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো – "তাহলে দুঃখই দাও - বলে দাও। বলো যে রীতি একটি South Indian ছেলের সঙ্গে একসাথে থাকছে।"

বাপ্পা বললো – "দ্যাখ, অবাঙালীটা কোনো বড়ো ব্যাপার নয় ..... সে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু .... তুই বিয়েটা করে ফ্যাল না!"

রীতি – "দাদাভাই, আমি বিয়েতে বিশ্বাস করি না তুমি তো জানো ! আমি এখন adult, নিজের ইচ্ছে মতো এই decision টা আমি নিতে পারি – তাই নয় কি?"

বাপ্পা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলো, তারপর বললো – "দ্যাখ, আমরা সবাই আমাদের ইচ্ছে মতো অনেক কিছুই করতে পারি কিন্তু করি না, কারণ আমাদের চারপাশে আরো কিছু মানুষজন আছে যারা আমাদের ব্যবহারে বা কাজে affected হয়।.... তোর যদি রবিকে ভালো লাগে, তাহলে বিয়েটা করতে অসুবিধে কি?"

রীতি বললো – "অসুবিধে অনেক। প্রথমত, রবিকে আজ ভালো লাগছে বলে যে কালও ভালো লাগবে তার কোনো মানে নেই – so the exit strategy should be simple and marriage makes it anything but simple. দ্বিতীয়ত, বিয়ে জিনিসটা জীবনে extra কোনো stability এনে দ্যায় বলে আমি দেখিনি, বিশ্বাসও করিনা। বিয়ে একটা institution, যেটা ধীরে ধীরে obsolete হয়ে যাচ্ছে – so why should I go through that complication for others' peace of mind?"

বাপ্পা আর তর্ক করলো না। ও বুঝে গিয়েছিলো যে তর্ক করে লাভ হবে না।

সেই রবির সঙ্গে প্রায় পাঁচবছর একসঙ্গে কাটিয়েছিলো রীতি। রবি ছিলো স্বভাবে চুপচাপ, ইন্ট্রোভার্ট যাকে বলে। যতটা ও মুখে বলতো, তার চেয়ে অনেক বেশীকথা ও চেপে রাখতো মনে। প্রায় দু'বছর একসঙ্গে থাকার পর রীতি জানলো যে রবি ভাইজ্যাগে নিজের বাড়ীতে যেতে চায়না।

রীতি প্রথমে ভেবেছিলো যে 'লিভিং টুগেদার' করছে সেটা মা-বাবার কাছ থেকে লুকোতে চায় বলে হয়তো বাড়ী থেকে ফোন করে না বা ছুটিতে বাড়ী যেতে চায়না। শেষে রীতি ওকে চেপে ধরলো, যখন দেখলো যে ওকে একা তিন-চারদিনের জন্যে ঘুরে আসতে বললেও ও যাচ্ছে না। অথচ রীতি মাঝেসাঝে সপ্তাহ খানেকের ছুটি নিয়ে একা কলকাতা ঘুরে আসছে।

অনেক চেষ্টায় রীতি শেষে জানতে পারলো যে রবির সঙ্গে মা-বাবার সম্পর্ক ভালো না। তাঁরা নাকি রবির আমেরিকা-প্রবাসী দিদির আর ডাক্তার দাদার সাফল্য নিয়ে এতো গর্বিত যে রবিকে প্রায় "লুজার" মনে করেন। বাড়ীতে সবাই এতো কথা বলে যে রবির কথা শোনার কারোর সময় নেই। ইত্যাদি ইত্যাদি....।

রীতি ওকে বোঝানোর চেষ্টা করলো যে এনসব ধারণাগুলো অনেক সময় আমাদের নিজেদের complex থেকে তৈরী হয় – তার basis প্রায় থাকেনা বললেই চলে। Adult হওয়ার পর এগুলো ঝেড়ে ফেলাই ভালো – রবিও জোরে জোরে কথা বলুক না! সবাইকে জানাক না ওর latest achievement!

রবি ঠিক মানলো কিনা সন্দেহ। বাড়ী গেলো একবার-দু'বার, কিন্তু নিজের পরিবারের সম্বন্ধে ঠাণ্ডা ভাবটা ওর গেলো না। রীতির সম্বন্ধে বাড়ীতে কাউকে কিছু বলেছে বলেও মনে হলো না।

রবি কম্প্যুটারে চৌখস – রীতিকে অনেক প্রোগ্রাম সহজে, কম স্টেপস-এ, করতে শিখিয়েছে রবি। কিন্তু ও নিজেকে 'sale' করতে জানে না বা করতে চায় না। রীতি যখন প্রমোশন এবং মাইনেতে jump নিয়ে দু-দু'টো চাকরি বদল করে ফেললো, রবি রীতির চেয়ে দু'বছরের সিনিয়র হয়েও তখনো analyst হয়ে প্রথম company-তেই রয়ে গেলো।

কম্প্যুটার নিয়ে খেলা করতে রবি ভালোবাসে, দিনের মধ্যে যতক্ষণ জেগে থাকে প্রায় ততক্ষণই। পার্টি বা বারে যেতে খুব উৎসাহ কোনোদিনই ছিলো না ওর। আগে বন্ধুরা জোর করে নিয়ে গেলে যেতো, রীতির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তাও যায় না।

বন্ধুরা অভিযোগ করে, কিন্তু ঘরকুণো রবিকে টেনে বার করতে পারে না।

রীতির আবার সেটা স্বভাব নয়।

'একসঙ্গে আছি বলে সারাক্ষণ দুজনেই শুধু বসে থাকবো' – এটা ওর না-পসন্দ।

রীতি তাই একাই বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পাবে যায়, হৈ চৈ করে। বাড়ীতেও পার্টি করে, লোকের বাড়ীর পার্টিতেও যায় – রবি যেতে না চাইলে ও একাই চলে যায়।

ইদানীং তো আরও যায় – বাড়ীতে প্রায় থাকেই না।

শীর্ষ মারা যাওয়ার পর রীতির কলকাতা যাওয়া কমেছে আর পাবে যাওয়া বেড়েছে। কিসের এক অস্থিরতা যেন ওকে ঠেলে নিয়ে বেড়ায়, নিজের মুখোমুখি বসতে দ্যায়না একমুহূর্তের জন্যেও।

রবি কোনদিন বারণ করেনি, তাই রীতি কষনো বোঝেইনি যে রবির এই ব্যাপারে কোনো আপত্তি আছে।

বুঝলো, যখন এক শুক্রবার পাব থেকে ফিরতে রাত হলো – বেশ রাত, কেউ সেদিন রীতিকে নামাতে আসেনি ..... ও একাই ছিলো।

হঠাৎ রবি রেগে গিয়ে কৈফিয়ত দাবী করতে শুরু করলো – 'এত রাতে রীতি একা .... কোথায় ..... কাদের সঙ্গে .... কেন ? ....'

ঈষৎ 'টিপসি' রীতি প্রথমে অবাক, তারপর ক্রুদ্ধ। কৈফিয়ত দাবী করার অধিকার সে কাউকে দ্যায়নি, রবিকেও না!

কথা কাটাকাটি বাড়তে বাড়তে ঝগড়ায় দাঁড়ালো।

রবি জানালো যে রীতির এই ব্যবহার তার পছন্দ নয়।

রীতি জানালো যে 'কেউ কারোর স্বাধীনতায় হাত দেবেনা' এই শর্তেই তারা একসঙ্গে থাকতে শুরু করেছিলো – সেই শর্ত ভঙ্গ হলে একসঙ্গে থাকতে রীতি রাজী নয়।

রবি বালিশ নিয়ে অন্য ঘরে শুতে চলে গেলো।

রীতি পরের দিন সকালে শোভার সঙ্গে টেম্পোরারী 'পেইংগেস্ট'-এর ব্যবস্থা করলো, এবং দু'দিনের মধ্যেই নিজের জিনিসপত্র নিয়ে শোভার ফ্ল্যাটে move করলো।

শোভা ওকে বলেছিলো যতদিন খুশী থাকতে, তবে রীতি মাস খানেকের বেশী থাকেনি।

নিজের কাজের জায়গার কাছাকাছি একটা ফ্ল্যাট দেখে উঠে গেলো ও।

রবির ফ্ল্যাট থেকে রীতির কাজের জায়গা বেশ দূরে হতো। এখনকার ফ্ল্যাটটা আবার শোভার ফ্ল্যাট থেকে অনেক দূর হয়ে গেলো। যাক গে, কি আর করা যাবে – সব তো আর পছন্দ মতো হয়না।

Move করার আগের দিন শোভার সঙ্গে প্রাণ ভরে আড্ডা দিলো রীতি।

শোভা ওকে পুরো সমর্থন দিয়েছে রবির ব্যাপারে।

শোভার মতে গার্হস্থ্য জীবনে কোনো সমঝোতা করা চলেনা – বাইরের জগতে অনেক সমঝোতা করে চলতে হচ্ছে আমাদের সবাইকে, তাই relax করার প্রয়োজন এখন ছেলেদের যতটা মেয়েদেরও ঠিক ততটাই।

এইটা যে ছেলে বুঝতে পারে না, তার সঙ্গে থাকা মানে stress বাড়ানো – যত তাড়াতাড়ি এইরকম জটিল সম্পর্ক থেকে বেরোনো যায়, ততই ভালো।

মাসে একবার অন্তত দু'জনে meet করবেই কথা দিয়ে, রীতি শোভার ফ্ল্যাট ছেড়ে নিজের ফ্ল্যাটে চলে গেলো।

সেই কথা এখনো রেখেছে রীতি আর শোভা। প্রতি মাসেনা হলেও, দেড়মাসে অন্তত একবার দু'জনের দেখা হবেই। হয় রীতির বাড়ীতে, নয় শোভার বাড়ীতে, নাহলে বাইরে – পার্টিতে বা শুধু দু'জনে।

শোভার বাড়ীর পার্টিতেই রীতি প্রথম meet করেছিলো রাজকে। প্রায় ছ'ফুট লম্বা রাজর্ষি অরোরা কিছুদিন হলো দিল্লী থেকে প্রমোশন নিয়ে শোভাদের ব্যাঙ্গালোরের অফিসে বদলি হয়ে এসেছে।

হাসিখুশী খোলামেলা স্বভাবের রাজকে রীতির প্রথম আলাপেই বেশ ভালো লেগে গেলো।

এই প্রথম দক্ষিণভারতে থাকতে আসা রাজকে দেখে, ওর নিজের প্রথম ব্যাঙ্গালোরের আসার দিনগুলো মনে পড়লো। গল্প করতে করতে রীতি বুঝলো যে রাজ এখনো দিল্লী miss করে। বন্ধুবান্ধবও বেশী নেইএখনো।

যদিও IIT Delhi থেকে engineering পাশ করা এবং USA-র Wharton School of Business থেকে MBA করা রাজ অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই দক্ষিণভারতীয় অফিসের দায়িত্ব পালন করছিলো, কিন্তু রীতির বাড়ীতে উত্তর ভারতীয়

রান্না খাওয়ার নেমন্তন্নটা যে ও খুব আনন্দের সঙ্গে নিলো সেটা রীতির নজর এড়ালো না। সপ্তাহ দুয়েক বাদে, শনিবারে রাজ আসবে কথা দিলো।

রবির সঙ্গে রীতির ছাড়াছাড়ি হয়েছে প্রায় সাত মাস হলো। রীতি এখন একটি বাংলাদেশী মহিলাকে রেখেছে রান্না এবং ঘরের কাজ করার জন্য। আহেলীদির থেকে রেসিপি নিয়ে মহিলাকে বেশ তালিমও দিয়েছে।

তাই রাজকে বেগুন ভর্তা, মটর পনির, ফ্রায়েডরাইস, লুচি আর কষা মাংস খাওয়াতে কোনো অসুবিধেই হলোনা ওর। সেদিন আর কোনো লোক ডাকেনি রীতি।একদম ঘরোয়া আড্ডা।

রাজ দারুণ খুশী। "The easiest path to a man's heart is through his stomach" কথাটা মনে পড়লো রীতির। একটু হাসিও এলো ঠোঁটের কোণে।

আশ্চর্য এই যে, তিরিশোত্তর রীতিও যেন পার্টির কোলাহলের চেয়ে এই শান্ত ডিনারটা আজ উপভোগ করলো বেশী।

বয়সে রীতির চেয়ে একবছরের ছোট রাজ, কিন্তু তারচেয়ে অনেক পরিণত ওর ব্যবহার। তবে স্বভাবে কোনো অহেতুক গাম্ভীর্য নেই – খুবই easygoing এবং আধুনিকমনস্ক। সমবয়সী ছেলেদের মধ্যে যে হিপোক্রেসি দেখতে রীতি অভ্যস্ত, কয়েকদিনের আলাপে অন্তত রাজের মধ্যে তার আভাস পেলো না ও। রীতি এক অফিসের লোক নয় বলে বোধহয় বন্ধুত্বের দিকে এগোনোটা সহজ হলো রাজের জন্যেও।

রীতি এবারে ছিলো অনেক সতর্ক। তাই প্রায় বছরখানেক কাটলো শুধু একজন আরেকজনকে বুঝতে, পরস্পরের expectations জানতে।

রীতি রবির কথা সবিস্তারে জানালো রাজকে। কেন ছাড়াছাড়ি হয়েছে তাও জানালো।

রাজের বান্ধবীদের কথাও শুনলো রীতি। নয়না আরক্রিস্টি।

বেশ কিছুদিন ডেট করার পরেও সম্পর্ক দুটো এগোয়নি – রাজ মনে করে যে compatibility ছিলো না।

নয়নার সঙ্গে ডেট করেছিলো কলেজ জীবনে – কোথাও কোনো মিল ছিলো না দুজনের। নয়নার মডেলের মতো ফিগার আর অসাধারণ সুন্দর মুখ সত্ত্বেও চারবছরের মাথায় সম্পর্কটা ভেঙে গেলো।

নয়না South-Indian film এ অভিনয় করতে গেলো।

আর রাজ USA চলে গেলো MBA করতে। সেখানে সহপাঠী ছিলো ক্রিস্টি।

একসময় মনে হয়েছিলো যে ধর্ম, জাত আলাদা হলেও দুজনে যেন দুজনের সঠিক জুড়ি। একসঙ্গে library তে দু'জনে পড়াশোনা করছে, weekend-এ bar-এ সময় কাটাচ্ছে, campus recruitment-এ চাকরির interview দিচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যেই দু'জনে একসঙ্গে থাকতেও আরম্ভ করেছিলো।

কিন্তু চাকরি শুরু করার পর যেন সবকিছু একটু অন্যরকম লাগতে শুরু করলো।

ক্রিস্টি আর রাজের expectations মেলার বদলে, আলাদা পথে যেতে শুরু করলো।

Student life এ sandwich খেয়ে থাকলেও, এখন একটু নানারকম খাবারের স্বাদ চায় রাজ।

কিন্তু ক্রিস্টি spicy food খেতে পারে না বলে Indian restaurant-এ আর কখনোই যাওয়া হয় না।

প্রতিটা ছুটিতেই ক্রিস্টির vacation plan করা থাকে, রাজের আর India যাওয়া হয় না – মা-বাবাকে আর দিল্লীকে miss করা বেড়েই চলে।

এইরকম সময়ে ক্রিস্টির পুরোনো বয়ফ্রেণ্ড টিমোথি আবার ফিরে এলো ওর জীবনে।

আর তারপরেই সম্পর্কটায় আস্তে আস্তে চিড় ধরে গেলো।

মানতে কষ্ট হলেও, রাজ বুঝলো যে ওর আর ক্রিস্টির সম্পর্কটা ছিলো 'rebound' – একটা ভেঙে যাওয়া সম্পর্কের হতাশা কাটানোর জন্য হাতের সামনে যাকে পাওয়া যায় তাকে নিয়েই আর একটা সম্পর্ক গড়ে তোলা ! অর্থহীন, গভীরতাহীন।

এইরকম একটা সম্পর্কে আটকে থাকার কোনো কারণ খুঁজে পায়নি রাজ, সুতরাং ক্রিস্টির সঙ্গে সম্পর্কটাও ভেঙেই গেলো।

এরপর রাজ একা থাকাই prefer করেছে।

মা-বাবা summer-এ এসে ওর কাছে একমাস থেকে গেলেন – ও তখন নিউইয়র্কে কাজ করছে।

এর প্রায় বছরখানেক পরে এই কোম্পানীতে একটা ভালো offer পেয়ে ও দিল্লী ফিরে আসে। তারপর দিল্লী থেকে ব্যাঙ্গালোর।

অনেক কথা শেষ হওয়ার পর, অনেক পথ-হাঁটার পর, তিরিশের ঘরে পা দেওয়া দুই মন আবার ধরা দিলো ভালোবাসার ফাঁদে। কিন্তু বিয়ের ফাঁদে নয়। লিভিংটুগেদার।

(চলবে)

১৯৯০ থেকে আমেরিকা প্রবাসী **ডঃ শকুন্তলা চৌধুরী** কর্মসূত্রে এবং ভ্রমণপ্রিয়তার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন ভাষাকে আপন করে নিলেও, বারবার ফিরে ফিরে আসেন এই বাংলায়, তাঁর মাতৃভাষার কাছে এক পরম ভালোবাসার টানে। ক্লাস ওয়ানে পড়ার সময় স্কুলের পত্রিকায় প্রথম একটি কবিতা প্রকাশ হয়। সেই শুরু, তারপর কলেজ, ইউনিভার্সিটি... প্রবাসের বঙ্গ সম্মেলন এবং আরো নানা পত্রিকায় লেখালেখির ধারাটিকে বজায় রেখেছিলেন, যদিও পেশাগত এবং পারিবারিক ব্যস্ততার কারণে সে ধারাটি ছিল নেহাতই ক্ষীণকায় নদীর মতো। দুই মেয়ে বড় হয়ে যাওয়ার পর, ব্যস্ততা একটু কমতেই ... সাহিত্যচর্চার আপাত শীর্ণ নদীটির মধ্য থেকে ফলগুধারা যেন এসে পড়লো সাগরের মোহনায় ! এই জানুয়ারিতে কলকাতায় প্রকাশিত তাঁর বই "পৃথা" বিদগ্ধ পাঠকমহলে সমাদৃত। ছাত্রজীবন, গোখেল কলেজের অধ্যাপনা, প্রবাসজীবন ও বাস্তব পৃথিবীর বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা আলো ফেলে তাঁর লেখায়... সেভাবেই একদিন লেখা হয় 'পরবাসী'।

ধারাবাহিক

প্রতীপ কুমার ভট্টাচার্য

পুরোনো দিনের কথা

পর্ব ৪

আশী বছর পূর্বের কলকাতার আরো কিছু বাল্যস্মৃতি

আমার ছোটপিসীমারা থাকতেন আপার সার্কুলার রোডে, এখন এ পি সি রোড নামে পরিচিত। প্রশস্ত রাস্তা, মধ্যভাগে ট্রামলাইন। তখন বাড়ীগুলির সামনে চওড়া প্রাঙ্গনের মতো ফুটপাত, তার ওপর একটি রেললাইন পাতা, যেটি বাগবাজার থেকে এন্টালী হয়ে ধাপা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই লাইনটির ওপর একটি ছোট বাষ্পীয় ইঞ্জিন দুটি মালগাড়ী সহ দিনে দু বার যাতায়াত করতো। এটি ছিল শহরের আবর্জনাবাহী রেলগাড়ী। সারা পথটিতে কয়েকটি "স্টেশন"ও ছিল, সেগুলিতে তার নিকট লোক-বসতিগুলি থেকে জঞ্জাল-আবর্জনা জমা করা হতো, ঐ মালগাড়ীটি সেগুলি সংগ্রহ করতো। "কু" বাঁশীর আওয়াজ শ্রবণমাত্র দৌড়ে গিয়ে পিসীমার বাড়ীর দোতলার জানলা থেকে আমরা ছোটরা সকৌতুহলে ছোট্ট রেলগাড়ীটির যাত্রা দেখতাম। পরশুরামের "কচি সংসদ" গল্পটিতে এই গাড়ীটিকে রঙ্গভরে ধাপা মেল বলে উল্লেখ আছে। বর্তমান ট্রামলাইন ঐ রেললাইনের স্থলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। রাস্তায় এখনকার তুলনায় যানবাহন অত্যল্প ছিল, বাসের সংখ্যাও মুষ্টিমেয়, তিন নম্বর বাসটি খুব জনপ্রিয় ছিল, শ্যামবাজার থেকে এসপ্ল্যানেড ও কালীঘাট হয়ে টালিগঞ্জ ছিল এর গমনপথ। তখন সব বাসই বেসরকারী, অধিকাংশই শিখ মালিকানায় ও চালনায়, চকচকে বিস্কুটের টিনের আকৃতি কিন্তু এদের রক্ষণাবেক্ষণ ত্রুটিহীন। তবে ট্রামই লোকের বেশি পছন্দসই ছিল, এর সংখ্যাও ছিল অধিক। কয়েকটি দোতলা বাসও ছিল, তবে সেগুলি নিতান্তই শ্রীহীন। স্বাধীনতার পর মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় প্রধান রুটগুলি জাতীয়করণ করেন, বাঘ-মার্কা নতুন আধুনিক বাসের প্রচলন হয়।

মাণিকতলা বাজারটি বাড়ীর নিকটবর্তী হলেও পিসেমশায় পছন্দ করতেন একটু দূরে শেয়ালদার বাজার। রবিবার ছেলেদের নিয়ে সেখানে পাইকারী দরে সস্তায় পাঁচ সের, দশসের পরিমাণের মাছ-শাক-শব্জী ও মুদিখানার জিনিস কিনে বহন করে আনতেন বৃহৎ সংসারের জন্য। অবশ্যই হন্টনে, ঐ রাস্তা কোন বাহনে আসার কথা ওঁরা চিন্তাও করতেন না তখনকার দিনে। পিসেমশায় শেয়ালদা কোর্টের উকিল ছিলেন, যাবার সময় ট্র্যামে গেলেও তাঁকে কখনও পদব্রজ ছাড়া কোর্ট থেকে ফিরতে দেখি নি। তখনকার লোকেরা অতি কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন, চূড়ান্ত গরম ছাড়া বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবহারও সীমিত ছিল। হাতপাখার প্রচলন ছিল সর্বদা।

নীচের তলায় পিসেমশায়ের অন্য আত্মীয়রা থাকতেন। সারা বাড়ীতে ছোট-বড় মিলে ডজনখানেক ছেলে-মেয়ে, আমরা দু-তিনজন বালখিল্য ছাড়া সবাই স্কুল বা কলেজের ছাত্র-ছাত্রী। বিকেলে বাড়ীর সামনে প্রশস্ত ফুটপাতের ওপরেই চৌকি পেতে দাদা-দিদিদের নরক গুলজার করে আড্ডা হতো। ঐ তল্লাটে কোনো গৃহস্ত বাড়ীর সংলগ্ন কোনো আঙ্গিনা থাকতো না, সদর দরজা খুলেই ফুটপাতে অবতরণ। অবশ্য বৃহৎ প্রাঙ্গনযুক্ত ভবনগুলি, যথা মূক-বধির বিদ্যালয় বা রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ ইত্যাদি ছাড়া। আড্ডার বিষয়বস্তুর পরিধি সীমাহীন, শৈলেন মান্নার পায়ের যাদু, ব্র্যাডম্যানের ইংল্যান্ড বোলারদের দুরমুশ করা, প্রমথেশ বড়ুয়া-কানন দেবীর হালের ছবিটিতে তাঁদের অসাধারণ অভিনয়, পঙ্কজ মল্লিক ও সায়গলের কণ্ঠ ও গানের তুলনা, সুভাষ চন্দ্র বোসের হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সর্বশেষ পরিস্থিতি, গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের ডাক ..... কি নয় সেই সব আলোচনার বিষয়! আমরা ছোটরা হাঁ করে শুনতাম, বুঝতাম না কিছুই তবে বড়দের প্রবল উচ্ছাস, উত্তেজনা ও প্রাণবন্ত আলোচনা শুনে শুনে বিখ্যাত নামগুলি সব মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। আমাদের সর্বাধিক আকর্ষণীয় ছিল বাড়ীর বিপরীত সুকিয়া স্ট্রীটের ও পাড়ার বিখ্যাত তেলেভাজা

দোকানের খাবার যা আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে মুখ চালাবার জন্য অপরিহার্য ছিল। সস্তা-গন্ডার দিন, দশ-বারো আনার (এখনকার ৫০-৭৫ পয়সা) আলুর চপ-বেগুণীতে সবার কুলিয়ে যেত। যেদিন বাবা-কাকার ঔদার্যে ছেলেরা টাকাটা-সিকেটা আদায় করতে পারতো, সেদিন তো মহাভোজ, আর একটি দোকান থেকে চপ-কাটলেট আসতো, পুরো নিটোল একটি কারুর ভাগ্যে হয়তো জুটতো না, অর্ধেক ভাগ খেয়েই আমরা সপ্তম স্বর্গে বিচরণ করতাম। সেই সব অল্প আয়, পরিমিত সংগতির দিনগুলিতে সাধারণ লোকেরা যে কত অল্পে পরিতুষ্ট হতো তা এই পঞ্চাশ হাজারী মোবাইল-স্মার্ট টিভি-নেটফ্লিক্স-মল-রেস্টুরেন্টের এক-হাজারী মূল্যের প্লেট খাবার-বিমানে দেশ-বিদেশ ভ্রমণের যুগে কল্পনাপ্রসূত মনে হয়।

মা-পিসীমারা ও বড় দিদিরা সাবালক দাদাদের তত্বাবোধনে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে হাতিবাগানে মিত্রা সিনেমায় নিউ থিয়েটার্সের "মুক্তি" চলচ্চিত্রটি দেখতে গেলেন, আমাদের চকলেট-আইসক্রীমের লোভ দেখিয়ে বাড়ীতে রেখে। এই ছবিটি সে যুগে জনপ্রিয়তার সব রেকর্ডই ভঙ্গ করেছিলো, গল্পে, পরিকল্পনায়, উপস্থাপনায় সেটি একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি করে চমকপ্রদ হয়েছিল। রাজকুমার প্রমথেশ বড়ুয়া তাঁর আসামের রাজ্য গৌরীপুরের জঙ্গলে হাতীর পিঠে চিত্রগ্রহণ করেছিলেন, তিনিই ঐ ছবির নায়ক। স্টুডিয়োর বাইরে শ্যুটিং এই দেশে সেই প্রথম প্রকল্প, এই অভিনব প্রচেষ্টায় জনসাধারণ প্রচন্ড আকৃষ্ট হয়েছিল। উপরন্তু পঙ্কজ মল্লিকের পরিচালনায় গানগুলি সব হিট, লোকের মুখে মুখে ফিরছে। ছায়াছবিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই প্রথম প্রবর্তন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অনুমতি দিয়েছেন "আজ সবার রং এ রং মেশাতে হবে", "বিদায় বেলার মালা খানি" কাননবালার কণ্ঠে ও "আমি কান পেতে রই" পঙ্কজের কণ্ঠে গান তিনটি ছবিটিতে সন্নিবিষ্ট করার জন্য। আর সোনায় সোহাগার মতো রবীন্দ্রনাথের খেয়া কবিতাটিতে পঙ্কজ মল্লিকের নিজের সুরে, রবীন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়েই, "দিনের শেষে ঘুমের দেশে" গানটিতে দর্শকদের উচ্ছ্বাস বাঁধনহারা হয়ে গিয়েছিল। গানটির আদর যে সর্বকালীন তা বোঝা গিয়েছিল যখন প্রায় অর্ধশতাব্দী পরেও পঙ্কজ মল্লিকের অনুমতি নিয়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গানটির রেকর্ড শ্রোতারা সমধিক আদরে গ্রহণ করেন।

পিসীমার বাড়ীর উত্তরের রাস্তার মোড়ে রামমোহন লাইব্রেরী। সেখানে প্রায়ই সভা-সমিতির উপলক্ষ্যে শহরের বহু মান্য ও বিজ্ঞ ব্যাক্তিদের সমাগম হতো। মা-পিসীমা-দিদিরা নিয়মিত ঐ লাইব্রেরি থেকে বই আনিয়ে পড়তেন। আর দক্ষিণের রাস্তাটি গড়পার রোড। ঐ রাস্তাতেই অবস্থিত সারা শহরের সুপরিচিত "বিষ্টু ঘোষের আখড়া"।

তখন ভারত পরাধীন, বিদেশী শাসকের পদানত এক বিক্ষুব্ধ দেশ। যুবকেরা হতোদ্যম, নিরুৎসাহ, তাদের দুর্বল স্বাস্থ্য ও ততোধিক ভগ্ন মনোবল। শ্রী বিষ্ণুচরণ ঘোষ এর প্রতিকার করতে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করলেন, যেথায় ব্যায়ামের মাধ্যমে যুবকদের শরীরগঠন ও মানসিক বিকাশের জন্য নানা বিষয়ের বক্তৃতা-আলোচনার আয়োজন করা হল। তাঁর এই প্রকল্পে ইন্দ্রজালের মতো ফল দেখা গেলো, যুবকদের উৎসাহ, উদ্দীপনা সীমাহীন হয়ে রইল, কিছুদিনের মধ্যে এর খ্যাতি শহরময় ছড়িয়ে পড়লো। এর সভ্যরা অধিকাংশই সাধারণ পরিবারের ছেলে, দুর্লভ পুষ্টিকর আহার তাদের অপ্রাপ্য, ঘরের ভাত-ডাল খেয়েও অধ্যাবসায়ের সাথে নিয়মিত ব্যায়ামে তাদের অপূর্ব পেশিবহুল শরীর শহরবাসীর বিস্ময় ও প্রশংসা অর্জন করলো। এমনকি সাহেবরাও এদের স্বাস্থ্যের তারিফ করতেন, যদিও এই সংস্থানটিকে এঁরা ঈষৎ সন্দেহের দৃষ্টিতেও দেখতেন স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ধারণায়। তারপর যখন মনোতোষ রায় ও মনোহর আইচ বিশ্ব দেহগঠন প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হলেন তখন এই আখড়াটির খ্যাতি সর্বত্র প্রসারলাভ করলো ও বৃটিশ শাসকদেরও সন্দেহের অবসান ঘটলো। ১৯৪৬ সালে দাঙ্গার সময়ে এই সমিতির যুবকবৃন্দ স্বয়ং বিষ্ণু ঘোষের নেতৃত্বে অকুতোভয়ে নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করে শত্রু অধ্যুসিত এলাকা থেকে অগুনতি অসহায় পরিবারকে রক্ষা করে আখড়ায় আশ্রয় ও আহার দিয়েছেন। কলকাতার ইতিহাসে এই কীর্তি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়ার উপযুক্ত।

এখানে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করে এই রচনাটি শেষ করি, যা তখন শহরে প্রচুর কৌতূহল ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল।

এটি অবশ্য আমার শোনা কথা, তবে লোকমুখে এর বহুল প্রচার হয়েছিল। শ্রী বিষ্ণু ঘোষের জামাতা, নাম বোধহয় বুদ্ধদেব বোস .... বুড়া বোস বলেই তাঁর পরিচিতি ছিল .... এক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত ছিলেন। সেই অবস্থায় তিনি অশেষ কষ্ট স্বীকার করে কৈলাস-মানসরোবর ভ্রমণ করেন, অধিকাংশ রাস্তাই পদব্রজে, তখন ঐসব পাহাড়ী রাস্তা অতি সংকীর্ণ, বিপদসংকুল, বাস চলাচলের অযোগ্য। সেই তীর্থস্থলে এক সাধু মহাত্মার কৃপায় তিনি রোগ থেকে সম্পূর্ণ নিরাময় হন। এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গে ছিল একটি ছোট মুভি ক্যামেরা ও ফিল্ম, যার সাহায্যে তিনি তাঁর ভ্রমণের চলচ্চিত্র তোলেন, ও ফেরার পর কয়েকটি ছোট হলে তিনি ছবিগুলি প্রদর্শন করেন। মনে আছে রামমোহন লাইব্রেরিতেও এই ছবিটি দেখানো হয়। এটি দেখতে দর্শকদের তখন আগ্রহ ও উৎসাহের অন্ত ছিল না। মনে রাখতে হবে সে যুগে কেদার-বদ্রীনাথ যাত্রাই অতি দুর্গম ছিল .... প্রবোধ স্যান্যালের মহাপ্রস্থানের পথের কথা স্মরণ করুন .... আর মানস-সরোবর তো অকল্পনীয় !

(ক্রমশঃ)

প্রতীপ কুমার ভট্টাচার্য – (বয়স – ৮৪+) তৎকালীন মাইশোর প্রদেশে ইউরোপীয়ান হাই স্কুলের পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান প্রাপ্তির পর যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী পাস (১৯৫৪-৫৮)। তৎপরে একটি আড়াই-বছরব্যাপী মর্যাদাপূর্ণ ট্রেনিং কোর্স ইংল্যান্ডের ম্যানচেষ্টারে এ.ই.আই কোম্পানীতে। সিইএসসি তে একাদিক্রমে ৩৪ বছর কর্মের পর ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনিয়ার পদ থেকে অবসর গ্রহণ (১৯৯৭)। অবসর জীবনে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা, বই পড়া, ফটোগ্রাফী, ও ফেসবুক, ট্যুইটার ইত্যাদির মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করা ও ইদানীং বাংলা ও ইংরাজিতে পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণ ও অন্যান্য সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত রম্য-রচনা লেখায় ব্যাপৃত।

শাশ্বতী বসু

কঙ্কণ

বই মেলায় একা একা ঘুরছিল মিনা। চোখে পড়ে লিটল ম্যাগাজিনের বিরাট স্টলের ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে একটি তরুণ একটি ম্যাগাজিন ডান হাতে তুলে ধরে "কঙ্কণ" কিনুন "কঙ্কণ" পড়ুন বলে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে। বাঁ হাত দিয়ে বুকের কাছে ধরা তার আরও এক বান্ডিল ম্যাগাজিন। বাহ বেশ নাম তো – "কঙ্কণ" । নামের মোহে মিনা পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় । কে জানে কেন তার নামটা এতো আকর্ষণীয় মনে হোল ?

দাম চুকিয়ে চলে আসতে গিয়ে শোনে তরুণ ম্যাগাজিন বিক্রেতা একজন ক্রেতাকে বলছে – লেখক অরুনাভ বাবু এখন ভেতরেই আছেন। স্টলের ভেতরে।

ঘাসে ঢাকা মাঠে বসে ম্যাগাজিনটায় চোখ রাখে মিনা। সাময়িক পত্রিকাটিতে তাঁদের এবারের বার্ষিক ছোটগল্প প্রতিযোগিতায় আসা বেশ কিছু গল্প আছে। "প্রথম প্রেম" – এবারের বিষয়বস্তু । আর প্রথম হওয়া গল্পটির নাম মাধবী-কঙ্কণ। এই গল্পর নামেই বর্তমান সংখ্যাটির নাম হয়েছে কঙ্কণ সংখ্যা। লেখক অরুনাভ রায়। মিনার মনে পড়ে যায় অনুরূপা দেবীর "মাধবী-কঙ্কণ" নামের গল্পটির কথা। পিসিমার লাইব্রেরিতে ঢুকে বয়স যখন ওর আন্দাজ দশ বছর তখন সেখানে দেখতে পেয়েছিল পিসিমার আমলের বিখ্যাত লেখিকা অনুরূপা দেবীর গ্রন্থাবলী। তারপরেই চোখ আটকে গেছিলো মাধবী-কঙ্কণ নামে গল্পটির ওপর। কিছুক্ষণ এগোতেই তন্ময় হয়ে গেছিলো গল্পের টানে। তারপরেই ছন্দ পতন। ঘরে জ্যাঠতুতো দাদার প্রবেশ। এবং যেটা প্রত্যাশিত সেটা হইল অকাল পক্ক দশম বর্ষীয়া বালিকার হাত হইতে বইটি একেবারে আলমারির সর্বচ্চ স্থানে উঠিয়া গেলো। পুরস্কার স্বরূপ জুটল ওই ভারী বইটিরই একটি গাট্টা। ঘটনাটা ভাবলে এখনও হাসি পায় মিনার। কি এক অজ্ঞাত কারণে সেই অসমাপ্ত গল্পটি আজও শেষ করে নি সে।

তাই এই ম্যাগাজিনে সেই একই নামের গল্পটি দেখে মিনার চোখ আটকে যায়। এ গল্পটি এবার সেরা গল্প। সে ডুবে যায় সঙ্গে সঙ্গে। বলার ভঙ্গীটি ভারী চমৎকার লেখক অরুনাভ রায়ের। মিনা দ্রুত পাতা ওলটায় আর বিস্ময়ে তার গলা শুকিয়ে যেতে থাকে ক্রমশ। এ যে অবিশ্বাস্য। কে এই লেখক ? সত্যিই কি ঠিক ঠাক পড়ছে সে ? আরো একবার মিনা চোখ রাখে গল্পের পাতায় .....

মাধবী-কঙ্কণ

"..... স্কুলে সেদিন কি কারণে আমার ক্লাস ছিল না। স্কুল একটু ঢিলে ঢালা ভাবে চলছিল। সবে বর্ষা শেষ হয়েছে। আকাশ পরিস্কার। সাদা সাদা হালকা পেঁজা তুলোর মত মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। উড়ছে কিছু পাখি ..... স্টাফ রুমের বিরাট জানলা গুলোতে আকাশের জলছবিটি পরিস্কার দেখা যাচ্ছিল। স্কুল বাড়ির প্রাঙ্গণের বিরাট বিরাট শিরিষ গাছের ফাঁক দিয়ে রোদের আল্পনা স্টাফ রুমের মেঝেতে লুকোচুরি খেলছে। কেউ নেই এখন আমার আসে পাশে। কমন রুমে বসে একটা বই পড়ছিলাম। মাধবী কঙ্কণ। বইয়ে মন ছিল না। জানলা দিয়ে মাঝে মাঝেই বাইরে হালকা মেঘের সঙ্গে দূরে কোন এক অনির্দিষ্টে মনটা ভেসে যাচ্ছিল।

হঠাৎ বিকাশ, এই রতনপুর উচ্চবিদ্যালয়ের আমার এক সহকর্মী তার স্বভাবসিদ্ধ চঞ্চল সাবলীল ভঙ্গীতে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে দুটি সদ্য কৈশোর পেরনো তন্বী ।

– এইতো সাধন রয়েছে। ভাগ্যিস তুই ছিলি – নাহলে এঁদের তো আলাপ করিয়ে দেবার মত কাউকেই পাচ্ছিলাম না।

গেল কোথায় সব কে জানে ! দুটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর সঙ্গে। জ্যেষ্ঠার দিকে তাকিয়ে – রুচিরা, আমার জামাইবাবুর বোন। পলিটিক্যাল সাইন্স, সেকেন্ড ইয়ার। বিকাশের মুখে যেন হাযার পাওয়ারের আলো। আর ইনি সুমনা – টুয়েলভ ফাইনাল ইয়ার। আমি চকিত। ততক্ষণে অনুজার দিকে চোখ পড়তেই আমার বিদ্যুৎ চমক লাগলো। শ্যামলা মেয়েটির দীঘল চেহারায়, দীর্ঘ পক্ষ্ম আয়ত চোখ দুটিতে আমি পলকের জন্য কি দেখতে পেলাম জানি না। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। জোড় হাত তুললাম। ওরা এগিয়ে এলো আমার দিকে। নমস্কার। তাকিয়ে দেখি জানালার বিরাট ফ্রেম ধন্য করে দাঁড়িয়ে যেন এক চিত্রলেখা। আমি আশিরনখ কেঁপে উঠলাম।

– ইনি সাধনব্রত। সংস্কৃত সাহিত্যের দিকপাল। কালিদাস রবীন্দ্র সাহিত্য নিয়ে ডুবে আছেন। পড়ছেন দিনরাত। বলেন খুঁজে চলেছেন। কি খুঁজছেন বা কাকে খুঁজছেন কে জানে। সে বোঝার মত এলেম এই আমার মত নিরস সাইন্স টিচারের নেই ..... আর সেটা সাধনও খুব ভাল করে জানে ..... একবার কি হয়েছিল ..... বিকাশ বলে চলেছে .....

আমি মুখ ভাল করে তুলে চাইতে পারলাম না। সুমনা আমার দিকে তাকিয়ে আছে বুঝতে পারছি। এতো সহজ, এতো অনাড়ম্বর এতো নিস্পাপ সেই চাহনি যেন মনে হচ্ছিল দিনের শুরুতে ঊষার প্রথম দৃষ্টিপাত পৃথিবীর ওপর। আমি এক আবছা বোধের ঘোরের মধ্যে যেন তলিয়ে যাচ্ছিলাম। মনে ভাবছি কে এই মেয়ে ? এই কি সেই ?

– কাব্য সাহিত্যের চলন্ত এডিশন .....

শুনতে পেলাম বিকাশের কথা আর হাসির শব্দ ।

– আমার একটু তাড়া আছে – এখনই যেতে হবে – শুনতে পেলাম আমি বলছি ওদের। কী যেন কেন বললাম। মুহূর্ত আগেও ঠিক করিনি যে এটা বলব। কিন্তু কি হোল বলে ফেললাম। আসলে আমি সরে যেতে চাইছিলাম সুমনার কাছ থেকে। কেন ? সেটাও পরিস্কার ছিল না সেই মুহূর্তে আমার কাছে। খালি মনে হচ্ছিল এক তীব্র বন্ধন আমায় যেন ঘিরে ধরতে চাইছে – আমি বেরোতে চাই – মুক্তি চাই ।

..... সুমনাও কি হেসেছিল জানি না – দেখিনি মুখ তুলে। বুঝতে পারছিলাম হঠাৎ করে চলে যাব বলায় ওরা খুব অবাক হয়েছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে। আর আমার মুখ চোখ মায় কানের গোরা অব্দি লাল হয়ে উঠছে।

কোনরকমে স্কুল থেকে তাড়াতাড়ি সেদিন বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। যেন একটা ঘোরের মধ্যে – মাথাটা ভার ভার লাগছিল। শুয়ে পড়লাম সেই মধ্যাহ্নের আলোর মধ্যেই। আলো সহ্য করতে পারছি না। চোখ ঢেকে ঘুমনোর চেষ্টা করলাম। বৃথা। উঠে পড়লাম। প্রিয় গ্রন্থ খুলে বসলাম। পাতায় পাতায় অনুজার মুখটি ভেসে বেড়াতে লাগলো।

হঠাৎ মনে হোল একি সত্যিই অনুজার মুখ ? কই – কেমন সে মুখ ? দেখেছি কি স্পষ্ট করে ? কি দেখেছি ? একটা অস্পষ্ট আদল ছাড়া কিছুই তো মনে আসছে না। বই মুড়ে বাগানে এলাম। অদূরে একটি ছোট পুস্করিনী – তাতে কচুরিপানার ফুল ফুটে আছে। হালকা বেগুনি। চকিতে মনে পড়লো এই রঙের শাড়ি পরনে ছিল। কিন্তু মুখ ? সে কেমন দেখতে ? মুখ মনে আসছে – কিন্তু আবার পরিষ্কার আসছেও না – এ এক অদ্ভুত অবস্থা ..... তাহলে ? কি হোল আমার ? দুহাতে মাথা ধরে বসে রইলাম ঘাটের সিঁড়িতে। রাত নিদ্রাহীন।

পরদিন স্কুলে গেলাম। সূর্যের আজ মুখ ভার। দেখা নেই সকাল থেকে। উত্তর আকাশে মেঘ করে আছে। যে কোন সময় ঝড় বৃষ্টি আসবে। কি ভেবে ছাতা নিলাম সঙ্গে যা কোনদিন করি না। স্টাফ রুমে আজ সবার খুব উৎসাহ। জোর আলোচনা চলছে। সামনেই থানা। সেখানে এক বিখ্যাত চোর ধরা পড়েছে। অন্যসাধন কে কেউ খেয়াল করল না। বিকাশের সাথে দেখা। ঠাট্টা করা তার স্বভাব। আমার দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। আমি একটু শঙ্কিত হলাম – ভাবলাম আমাকে কি দেখতে অন্যরকম লাগছে ? বিকাশ আবার কিনা কি বলে বসে। বিকাশ সেদিক দিয়েই গেলো না। স্বাভাবিক

ভাবেই বলল – কিরে কেমন লাগলো ওদের ? বলিস তো চল একদিন ওদের বাড়িতে যাই একসাথে। সম্পর্ক আছে। কোন অসুবিধে নেই। কি হোল আমার, মুহূর্তের মধ্যে বলে ফেললাম

– সত্যি ? সত্যি পারবি একদিন আমাকে ওদের বাড়িতে নিয়ে যেতে ? শুধু একবার। আর কোন দিন বলব না।

বিকাশ হা হা করে হাসতে গিয়েও আমার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলো। আমার মুখে কি দেখে সে এমন গম্ভীর হয়ে গেছিলো ? বুঝলাম না। কিন্তু এক টুকরো কাগজে অনুজাদের ঠিকানা লিখে বলল

– চলে যা একা। কিছু অসুবিধে হবে না। আর একটা বই নিয়ে যাস আমার কাছ থেকে। রুচির কাছ থেকে নিয়েছিলাম। যেন ওদের বই তুই ফেরত দিতে এসেছিস।

আর আমি ? কি নিয়ে যাব ওর জন্য ? কি ? সারদিন কাজকরমের ফাঁকে ফাঁকে এই চিন্তাই আমাকে ঘিরে থাকল। তাঁর জন্য কি নেওয়া যায় ।

বাগানে গেছি সন্ধ্যার দিকে। ছোট একটা বসার জায়গা আমাদের মাধবীলতা গাছটির তলায়। এই শরতেও কিছু ফুল ফুটে আছে। হাওয়ায় ভাসছে ফুলের মৃদু সুবাস। আমি গিয়ে গাছটির তলায় বসলাম। মনে পড়ল অনুজাকে। মনে পড়লো মাধবী কঙ্কণ পড়তে পড়তে হঠাৎ তাঁকে দেখতে পাওয়ার মুহূর্তটি। আমি একটা মাধবী-লতার নরম ডাল ভেঙ্গে একটা কঙ্কণ বানালাম। খামের মধ্যে ভরলাম। একটা কাগজে লিখলাম

"আমার বাগানের মাধবী-কঙ্কণ"

প্রিয় বান্ধবী কে,

খাম আর বইটি নিয়ে দুরু দুরু বক্ষে ঠিকানা মিলিয়ে অনুজাদের বাড়ির সামনে গিয়ে যখন দাঁড়ালাম রাত তখন সাতটা। ছোট মফঃস্বল শহর। এর মধ্যেই পথে ঘাটে লোক নেই। অনুজাদের বাড়ি বড় রাস্তা থেকে কিছুটা জমি পেরিয়ে অদূরেই দেখা যাচ্ছে। ওদের বাড়ির গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম ।

পুরো বাড়ি অন্ধকার। কোথাও একটা আলোর চিহ্ন নেই। দূর থেকে কোথাও থেকে একটি খালি গলার গান ভেসে আসছে – একটা বিষাদ মাখা সুর – সুরটা যেন চেনা চেনা ঠেকছে – কান পেতে রইলাম । ঠিক ধরতে পারছি না। ভুলে গেলাম পারিপার্শ্বিকতা। ভুলে গেলাম কেউ যদি আমাকে এইভাবে এখানে দেখে তার প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে।

অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছি ..... বাস্তব পৃথিবীর দৃশ্যপট সরে সরে যাচ্ছে চেতনা থেকে – সেখানে শুধু আদিগন্ত বিস্তৃত অতল অন্ধকার সমুদ্রের তলদেশ থেকে এক গভীর বাণী ধীরে ধীরে উঠে আসছিল আমার উপলব্ধিতে – এই তোমার প্রাপ্তি – এই অমৃত – এই অন্ত – এই অনন্ত – এই হলাহল – সঙ্গে সঙ্গে চমকে তাকিয়ে দেখি সমুখের জানলায় আলো জ্বলে উঠলো – এক ফালি আলো এসে পড়লো বাইরের অন্ধকার জমিতে – কালো দিগন্তে যেন একটি আলোর রেখা দেখা দিল – যেন কষ্টিপাথরে ফুটে উঠেছে খাঁটি সোনার রেখাটি – যেন এই পরম মুহূর্তটির – যেন এই পরম মুহূর্তটির উপলব্ধিতে আছে যে এক এক পরম – প্রাপ্তি তাঁরই ইশারা এই আলোর উদ্ভাসে – যেন আমার জীবনের এই দীর্ঘ খুঁজে বেড়ানর এই-ই পরম গন্তব্য। সত্যি ই কী তাই ? এই পরম উপলব্ধির তীব্র আকস্মিক সংবেদনে আমি তখন অবশ।

দাঁড়ালাম কিছুক্ষণ। তাঁকে দেখার সেই তীব্র আকুলতা যেন শান্ত হয়ে এলো। অনুভব করলাম আমার প্রথম প্রেমের বাত্যাবিক্ষুব্ধ হৃদয় অনেক শান্ত, অনেক শীতল। "সেইখানেতে ঢেউ উঠেছে এপারে পারে" – মনে হোল আমার মনের এ ঢেউ তো তাঁর কাছ থেকেই আসছে। সেখানেই আমি যেন পূর্ণ পরিতৃপ্তির আস্বাদন পাচ্ছি। আমি যেন পেয়েছি তাঁকে। আমার মর্ম কোষে ফুটে উঠছে এক নীল পদ্মের কুঁড়ির আভাষ। এক গভীর প্রশান্তিতে মন ছেয়ে গেলো। আমি ফিরে চললাম

– সঙ্গে সেই মাধবী-কঙ্কণ।

সে কঙ্কণ এখনো আছে – আমার প্রিয় বইএর ভাঁজে আর আমার আপন হৃদয় -গহনে, আমার প্রথম প্রেমের সুরভি নিয়ে শান্ত স্নিগ্ধতার সঙ্গে জড়িয়ে।

মিনা বইটি মুড়ে চুপ করে বসে থাকে। মনে ভেসে ওঠে এক ছোট্ট মফস্বল শহর। দুই বোন। রুচি আর মিনা। রুচি দুর্দান্ত অশান্ত, বেপরোয়া। খেলাধুলোতে দক্ষ। আর নিত্যি নতুন নিষিদ্ধ কাজে তার দারুণ আসক্তি। মিনা তার সহকারী। তার ভাল লাগা গানে। সে ভাল গান গায়।

রুচি কলেজে আর মিনা স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্রী তখন। বাবা সারাদিন তার কাজ কর্ম নিয়ে ব্যস্ত। বাবার দেখা ওরা খুব কমই পেত। মা প্রতিমা দেবীই ছিলেন সব। তিনি অসম্ভব শাসন করতেন মেয়েদের। তাই শাসন ভাঙ্গার জন্য অদম্য আগ্রহ ছিল রুচির। সে দক্ষ হয়ে উঠছিল অনিয়মে।

একদিন স্কুলে না গিয়ে দিদি উঠে পড়লো অটোতে। উদ্দেশ্য দিদির সদ্য আলাপ হওয়া এক সিনিয়র বন্ধুর সঙ্গে দেখা করা। তিনি পাশের শহরের এক স্কুলের ম্যাথম্যাটিকস এর টিচার। কি করে যে রুচির সাথে তার আলাপ এটা এখনো মিনার কাছে পরিস্কার নয়। তবে সে এও জানে যে রুচির মুগ্ধ স্তাবকের সংখ্যা নেহাত কম নয় এবং ক্রমবর্ধমান। কিন্তু ইনি কে এখনো মিনা চর্ম চক্ষে দেখেনি। কৌতূহল তারও কম নয়।

তবে মিনার বেশ অস্বস্তি হচ্ছে। মা যদি কোন রকমে জানতে পারেন তাদের এই অভিযানের কথা – সেটা ভাবতেই তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। "ভাবিস না স্কুল টাইমেই বাড়ি ফিরে যাব" – এই আপ্ত বাক্যে অবগাহন করে রুচিরা অসম্ভব নির্বিকার – কোনই ভাবান্তর নেই।

ওরা কিছুক্ষণের মধ্যেই অটো থেকে নামলো। কিছুটা এগোতেই এক ছিপ ছিপে চশমা পড়া এক মাথা চুলের তরুণ হাসিমুখে এগিয়ে এলো ওদের দিকে। ওমা এ ভদ্রলোক তো তার চেনা। কিন্তু কোথায় যেন দেখেছে ? পরিচয় পর্বে সব কৌতূহলের অবসান হোল। তারপর ওদের দুজনকে নিয়ে বিকাশ সোজা স্কুলের ভেতরে, স্কুলের টিচারদের কমন রুমে।

– আরে তুই ওখানে চুপচাপ বসে আছিস কেন ? এগিয়ে আয় না ? বিকাশ এক তরুণ টিচারের দিকে তাকিয়ে বলে।

তিনি পায়ে পায়ে ভীষণই কুণ্ঠিত ভাবে এগিয়ে এলেন।

– স্যান্সক্রিট টিচার, অরুনাভ। কালিদাস আর রবীন্দ্রনাথে এ ডুবে গেছে একেবারে। মিনা বুঝল ইনি কাব্যের একজন ভক্ত পাঠক। ভদ্রলোক দেখতে একেবারে কার্ত্তিক – একটু ভারী চেহারা। পাতলা প্রায় মেয়েদের মত লাল ঠোঁট – টক টকে গায়ের রঙ। মাঝারী উচ্চতা। হালকা চুল পাশে সিঁথি। ভদ্রলোক লাজুক ধরণের – কথাও কম বলেন। অন্তত বিকাশের তুলনায় তো ভীষণই কম। কোন রকমে একটু নমস্কার করে ভদ্রলোক দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ।

পালানোর ভঙ্গি দেখে মিনা হেসে ফেলে। হাসির মাত্রাটা বোধ হয় বেশী হয়ে গেছিলো। অরুনাভ যেতে যেতে ফিরে তাকিয়েছিল – মিনার হাসির শব্দে। আর তাকে একবারের জন্যও দেখা যায় নি তার পরে।

বেশকিছু দিন পর বিকাশদা এসে হাজির বাড়িতে। গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন মিনাকে

– জানো অরুনাভ এসেছিল তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য।

– সে কি ? কই আসেন নি তো ? আর হঠাৎ আসতেই বা যাবেন কেন ? মিনা অবাক হয়েছিল।

বিকাশদা গম্ভীর। হাসছেন না। বললেন – ওর কেস গুরুতর। সে খালি তোমাকে দেখছে সব জায়গায়।

মিনা হেসে ফেলেছিল। বলেছিল – ওই যে লাজুক ভদ্রলোক ? উনিই তো অরুনাভ ?

– হ্যাঁ। হেসো না। বি সিরিয়াস।

আচ্ছা হাসব না। বলে মিনা আবার ও হেসে ফেলে। বিকাশ চলে যাবার পর মিনা বই নিয়ে বসেছিল সেদিন। আর কখনো ব্যাপারটা ওর মনে পড়েছে বলে মনে পড়ে না।

তারপর – তারপর যুগ কেটে গেছে। রাজনৈতিক অস্থিরতায় সমস্ত কিছু ওলটপালট হয়ে গেলো। মিনারা কলকাতায় চলে এসেছে। কে কোথায় ছিটকে গেছে। রুচিরার মুখেও বিকাশের কথা আর শোনা যায় নি। আর এতদিন পরে ম্যাগাজিনের পাতায় অরুনাভর জবান বন্দী। তাঁর প্রথম প্রেমের অকপট স্বীকারোক্তি ।

মিনা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। ভাবে ওকি একবার অরুনাভর সঙ্গে দেখা করবে ? পরক্ষণেই অদ্ভুত এক চিলতে হাসি তাঁর ওষ্ঠে ফুটে ওঠে। সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। আশপাশের গাছগাছালি থেকে বাসায় ফেরা পাখীদের দিনান্তের হিসেব নিকেশ চলছে উচ্চস্বরে। মেলা প্রাঙ্গণে আলো জ্বলছে। স্টলের কাঠামোগুলো সে আলোর বেশীর ভাগ শুষে নিয়েছে। আলোছায়ার লুকোচুরি চলছে যেন। মিনা উঠে পড়ল।

Saswati Basu — Profession: University Teacher in Economics, lives in Sydney. I enjoy this beautiful life thoroughly. Particularly I enjoy listening to songs, reading books on sociology, short stories, and travelling around. I love watching drama, good cinema and tennis. I also love to experiment with new cooking recipes and share them with our friends. Believe in donating money to voluntary organisations for the people in need.

রজত ভট্টাচার্য্য

গোলকিপার

সবে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা শেষ হয়েছে, বুঝলি! দিব্যি আছি। খাই, দাই, ফুটবল খেলি, হাত সুতো দিয়ে খালে পুঁটি মাছ ধরি আর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারি। তা একদিন সন্ধ্যে বেলা বাড়ি ফিরতেই মা বলল জ্যাঠামশাই ডেকেছেন। আমার জ্যাঠা ছিলেন রাশভারী লোক। আমরা পারতপক্ষে তার আসে পাশে ঘেঁষতুম না। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে দোতলায় গিয়ে দেখি জ্যাঠা খাটের ওপর বাবু হয়ে বসে পইতেতে গ্রন্থি দিচ্ছেন। পৈতেতে গ্রন্থি দেবার সময় কথা বলা চলেনা। আমায় দেখে ইশারায় ভিতরে এসে বসতে বললেন। আমি ভিতরে ঢুকলুম না, চৌকাঠেই দাঁড়িয়ে রইলুম। তখনকার দিনে, বুঝলি, গুরুজনের সামনে অমনি হুট করে সমানে সমানে বসা যেতনা। আর বসার জায়গা বলতে তো ঘর জোড়া বিরাট খাট। তাতে আবার পায়ার তলায় দু'টো করে ইঁট বসানো। রাজ্যের হাবিজাবি রাখা তার তলায়। গ্রন্থি দেওয়া শেষ হলে সেটাকে পাকিয়ে তাকের ওপর রাখা গীতার ওপর রেখে জ্যাঠা আবার খাটের ওপর বসলেন। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন "তোকে একবার নৈহাটি যেতে হবে। সেখেনে আমার গুরুভাইয়ের বাড়ি। গুরুদেব এখন সেখেনেই অবস্থান কচ্চেন। তুই গিয়ে তাকে নিয়ে আসবি। কাল ভোর ভোর বেরুবি, কাল সেখানেই থাকবি, পরশু গুরুদেব কে নিয়ে ফিরবি। ফেরার পথে শিয়ালদা থেকে ট্যাক্সি করে গুরুদেব কে নিয়ে আসবি। আমি নাড়ুর সাথে কথা কয়ে রেকেচি। সকালে সে তার ট্যাক্সিতে সাঁতরাগাছি থেকে লোক নিয়ে রোজ শিয়ালদা যায়। সে সেকেনে সাড়ে আটটা অবধি থাকে। চা-টিপিন করে। তুই সেকেনে সাড়ে আটটার মধ্যে পৌঁছুলেই হবে। ভাড়া যা লাগে, আট টাকা কি দশ টাকা, দিয়ে দিবি। দর-দামের ব্যাপার নেই।"

আমি এতক্ষণে কথা বললাম "শিয়ালদা থেকে বাড়ি অবধি দশ টাকা ? এত কম ?" সত্যেন জেঠু বেগুন ভাজা শুদ্ধু লুচি মুখে ঢুকিয়ে চিবোতে চিবোতে হাত নাড়িয়ে কিরকম একটা মাছি তাড়াবার মত ভঙ্গি করলেন। তারপর লুচি টা খাওয়া হলে বলল "সে সব দিনে দশ টাকায় একটা জয়েন্ট ফ্যামিলির এক বেলা ভোজ খাওয়া হয়ে যেত। ছটাকা ভাড়ায় ইডেন গার্ডেন থেকে ট্যাক্সি চেপে বাড়ি ফিরেছি। সে তোরা ভাবতেও পারবি না।"

এখানে বলে রাখি সত্যেন জ্যেঠু আমার নিজের জ্যেঠু নন। আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে থাকেন। আগে কোল ইন্ডিয়াতে চাকরি করতেন। এখন রিটায়ার করেছেন। আমি আকাশনীল চ্যাটার্জী, এবার ক্লাস নাইনে উঠব। লক ডাউন হবার পর থেকে বাড়ি থেকে বেরোনো একেবারে বন্ধ। কিন্তু সত্যেন জ্যেঠুর বাড়ি আসতে দিতে মা'র আপত্তি নেই। লুচি-বেগুন ভাজা আমার ফেভারিট। তাই খেতে খেতে কথা হচ্ছিল।

জ্যেঠু আবার শুরু করলেন।

"আমি মিনমিন করে বললাম 'তা তাঁরা আমায় চিনবেন কি করে ? একটা হাত চিঠি কি কিছু ...' জ্যাঠামশাই ভুরু কুঁচকে বললেন 'তুই গিয়ে বলবি আমি উমাপতি সান্যালের ভাইপো। ব্যাস, তাতেই হবে।' এরপর আর কথা চলেনা। গুটি গুটি নিচে চলে এলুম। পরদিন সাত সকালে, তখনও আলো ফোটেনি, জ্যাঠা আমাকে হাঁক-ডাক করে তুলে দিলেন। চান করে, চারটি দুধ-খই খেয়ে, ফর্সা জামা-প্যান্ট পরে রওনা দিয়ে দিলুম। তখন শিয়ালদা যেতে সাঁতরাগাছি থেকে ট্রেন ধরে আগে হাওড়া যেতে হত। তারপর ট্রাম কি বাস ধরে শিয়ালদা। তা যা হোক করে শিয়ালদা পৌঁছে টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসলুম আর ঝিমোতে ঝিমোতে নৈহাটি পৌঁছে গেলুম। যে বাড়ি যাবো তাদের ঠিকানা কাগজে লিখে এনেছিলুম। স্টেশনের লাগোয়া বট গাছের পাশে মিষ্টির দোকানে দেখাতেই রাস্তা দেখিয়ে দিল। আরও বলে দিল রাস্তায় কাউকে জিজ্ঞেসা করতে হলে যেন মুখুজ্জে বাড়ি বলি। গুটি গুটি চলা শুরু করলুম। পাকা রাস্তা খানিক পরেই শেষ হয়ে গিয়ে কাঁচা রাস্তা শুরু হয়েছে। প্রায় আধ ঘন্টা হাঁটার পর একটা মোড়ের মাথায় পৌঁছুলুম যেটার কথা মিষ্টির দোকানের ছেলেটা বলে রেখেছিল। তারই

কথা মত বাঁ দিকের রাস্তা দিয়ে একটু এগুতেই দেখলুম রাস্তার ধারেই দু তলা পাকা বাড়ি, সামনে ছোট একচিলতে জায়গা। পাঁচিল-টাচিল কিছু নেই, সিধে সদর দরজা, তার আগে একটা কলাপসিবল গেট লাগান। কলাপসিবল গেটের পিছনে সবুজ রঙের দরজায় বাদামী কাঠের ফলকে সাদা দিয়ে গোটা-গোটা করে লেখা – শ্রী তারাপদ মুখার্জী, বি.এ.। কলাপসিবল গেট খোলাই ছিল। দরজায় ঠেলা দিতে সেটাও খুলে গেল। মুখ বাড়িয়ে দেখলুম ইঁটের উঠোন মত রয়েছে সামনে, তার পরেই চুনকাম করা দুটো ঘর, দুটোতেই তালা মারা। ডান দিকে একটু তফাতে আরো গুটি দুই টিনের চালের ঘর, বোধহয় কলঘর কি রান্না ঘর। তাতে আবার বাইরে থেকে শিকলি টানা। চুনকাম করা ঘর গুলোর পাস দিয়ে সরু সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। থাকার মধ্যে আছে দেওয়ালে ঠেস দেওয়া একটা চৌকি, তাতে ডাঁই করে হাবিজাবি জিনিস রাখা। 'মুখুজ্জে বাবু বাড়ি আছেন' বলে হাঁক পাড়ব কিনা ভাবছি, এমন সময় কে যেন খিঁচিয়ে উঠল, 'কি চাই ? কি মতলব ? ইতি উতি দেখছ যে বড় ! কি ভেবেছ বাড়ি তে কেউ নেই ? সেই তালে ...' আমি তাকিয়ে দেখলুম কোত্থেকে একটা বুড়ো মতন লোক এসে বসেছে চৌকিটার ওপর। রোগা, লম্বা, মুখে খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি। বেখাপ্পা ঢলঢলে মেটে রঙের জামার সাথে নীল চেক চেক লুঙ্গি পরা, হাতে একটা নিবে যাওয়া হুঁকো। হুঁকো বুঝিস তো ?" জিজ্ঞেস করলেন সান্যাল জ্যেঠু। আমি বললাম "বুঝি। সিনেমায় দেখেছি।" সান্যাল জ্যেঠু উদাস স্বরে বললেন "আজকাল আর কেউ হুঁকো খায় না। সে অবিশ্যি আমাদের সময় থেকেই প্রায় বন্ধ হয়ে গেছিল। আমাদের সময় দেখেছি যদু খুড়োকে। এক হাতে হুঁকো টানতে টানতে আরেক হাতে ঘুড়ির কলকাঠি ঠিক করে দিত। ওর তৈরি মাঞ্জার খুব নাম ছিল। মেটিয়াবুরুজের আব্দাল্লার মাঞ্জার সাথে টক্কর দিত। সে যাকগে। তো সেই বুড়ো নিভে যাওয়া হুঁকোই টানতে টানতে আমায় আপাদমস্তক দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল 'নাম কি তোমার ছোকরা ?' আমি বার কয়েক ঢোঁক গিলে মিনমিন করে বললুম 'আজ্ঞে আমি উমাপতি সান্যালের ভাইপো।' 'তা ইস্কুলের খাতায়ও কি ওই কথাই লেখা আছে নাকি ? এই লেখা পড়া শিখেছ !' এই অবধি বলে সেই বুড়ো কটমট করে তাকিয়েই রইল। আর আমিও হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম। মুখে আর কথা জোগাল না। এমন সময় ওপর থেকে কে যেন বলল 'পল্টে, দেখত, কার যেন গলা পেলাম নিচে।' তারপরেই সিঁড়ির ওপরের বারান্দা থেকে একটা আমারই বয়সী ছেলে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল 'কি চাই ?' আমি কোন রকমে বললুম 'আমি শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ সান্যাল, শ্রীযুক্ত উমাপতি সান্যাল আমার ...' কথা শেষ না হতেই বারান্দায় একজন ভারিক্কি চেহারার লোক এসে নীচে মুখ বাড়িয়ে আমায় দেখে বলল 'উমাদার ভাইপো ? তা এত দেরি হলো যে! দাঁড়িয়ে কেন ? উঠে এস ওপরে।' আমি আড় চোখে চেয়ে দেখি আশ্চর্য্য ! বুড়োটা আর নেই। এই তালে কোথায় সটকালো কে জানে ! গুটি গুটি উপরে উঠে গেলাম। ভারিক্কি চেহারার ভদ্রলোক হেসে বললেন 'আমি তারাপদ মুখুজ্জে, উমাদা আমার গুরুভাই হন।' আমি আর দেরি না করে ঝপ করে প্রণামটা সেরে নিলাম। উনি খুশি হয়ে বার কয়েক 'থাক, থাক' বলে আমার হাত ধরে 'এস, ভিতরে এস' বলে সামনের দিকে হাঁটা লাগালেন। এক চিলতে সরু বারান্দা। তার পাশে স্কুল ঘরের মত চেহারার চারটে ঘর। তার প্রথমটা ছেড়ে দ্বিতীয়টায় আমরা ঢুকলুম। লাল মেঝের ঘর জোড়া পেল্লাই খাট। একটা জাঁদরেল লোহার আলমারি, আলনা আর তাতে পাট পাট করে কাপড় চোপড় রাখা আর গোটা দুই বেতের মোড়া ছাড়া ঘরে আর আসবাব নেই। খাটের মাথার কাছটায় জানলার আলসেতে গোটা দুই কাঁচের গ্লাস আর জোয়ানের আরকের শিশি। ভদ্রলোক বললেন 'বস, বস, আহা, মোড়ায় কেন, খাটে এসে বস। পল্টে, তোর মাকে ডাক। জল-বাতাসা দিতে বল। অনেক দূর থেকে এসেছে। আহা, বেচারার মুখখানা শুকিয়ে গেছে।' পল্টে এতক্ষণ চুপ চাপ দাঁড়িয়ে ছিল। এবার 'মা, মা' করে ডাকতে ডাকতে ভিতর দিকে চলে গেল। তারাপদ বাবু আমায় জিজ্ঞেসা করলেন 'তা তুমি কি কর বাবা ?' আমি বললুম এই ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছি, এখনও রেজাল্ট বেরোয়নি। উনি বললেন 'বেশ, বেশ।' কথা বার্তা এরকম এগুচ্ছে এমন সময় একজন ভদ্রমহিলা এইব্বড় কাঁসার বাটি আর জলের গ্লাস নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। জলের গ্লাস মোড়ার ওপর নামিয়ে রেখে কাঁসার বাটি নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন 'অনেক দূর থেকে এসেছ বাবা, ক্ষিদে পেয়েছে খুব নিশ্চই, এটুকু চট করে খেয়ে নাও, নইলে পিত্তি পড়বে। দুপুরের খাওয়া এখনও ঢের দেরি।' আমি আন্দাজে বুঝে নিলুম ইনি হচ্ছেন পল্টের মা। চট করে প্রণাম করতেই উনি আমার থুতনি ধরে 'ভাল থাক বাবা' বলে আমার হাতে বাটিটা ধরিয়ে দিলেন। দেখলুম একবাটি নারকোল-মুড়ি, ওপরে বেশ করে চিনি ছড়ানো। খিদে বেশ ভালোই পেয়েছিল। তাই দেরি না করে শুরু করে দিলুম। তারাপদবাবু এবার বললেন 'তা উমাদা কি

বলে পাঠালেন ?' আমি বললুম 'কাল সক্কাল বেলা গুরুদেব কে নিয়ে রওয়ানা হতে।' তারাপদবাবু একটু আমতা আমতা করে বললেন 'সে রকমই কথা ছিল, কিন্তু গুরুদেবের শরীর একটু খারাপ হয়েছে, আসলে বয়স হয়েছে তো। তা একদিন পরে গেলে হয় না ?' আমি ততক্ষণে বেশ খানিকটা মুড়ি-নারকেল প্রাণপনে চিবুচ্ছি। তাই চট করে না করতে পারলুম না। চিবুনো শেষ করে খানিকটা জল খেয়ে বললুম 'বাড়ির সকলে ভয়ানক চিন্তা করবে, তাই ....' তারাপদবাবু মাথা নেড়ে বললেন 'তাতে অসুবিধা নেই, এখানকার পোস্ট অফিসে ফোন আছে। তোমাদের প্রতিবেশী জহর বাবু উকিল, ওনার বাড়িতেও তো ফোন আছে। আমিতো ও ভাবেই উমাদা কে আগেরবার খবর দিলুম। তোমার কোনো অসুবিধা নেই তো ?' আমার আর কি অসুবিধে ! তা সে কথা বলতেই তারাপদবাবু উঠে পড়লেন। বললেন 'আমি চট করে গিয়ে ফোনটা করে আসি, তুমি ততক্ষণ একটু বিশ্রাম নাও, গুরুদেবের সাথে দেখা কর, জল-টল খাও। আমি এখনই ঘুরে আসছি। পল্টে, আই পল্টে....' বলতে বলতে উনি তাড়াহুড়ো করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পল্টে আমার থেকে বছরখানেকের ছোট, মোহনবাগান সাপোর্টার আর বিদেশ বোসের ভক্ত। তাই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমি পল্টের বহুদিনের পরিচিত সতুদা হয়ে গেলাম। ইতিমধ্যে তারাপদবাবু ফিরে এসেছেন এবং দুপুরে রুই মাছের মুড়ো সহযোগে আইঢাই খেয়ে পল্টের বিছানায় শুয়ে ওর কথায় দু বার হুঁ দেয়ার পরেই দেখি বিকেল হয়ে গেছে। পল্টে ঘরে নেই। ঘরের বাইরে পল্টের মা, মানে কাকিমা, মাটিতে থেবড়ে বসে গুটি পাঁচ-ছয় হ্যারিকেনের চিমনি পরিস্কার করছিলেন। আমায় দেখে বললেন 'সতে চা খাবে নাকি ?' আমি তখন চা খেতুম না। তাই মাথা নেড়ে না করেই জিজ্ঞেস করলুম পল্টে কোথায়। কাকিমা বললেন সামনেই সবুজ সংঘের মাঠ। পল্টে সেখানেই গেছে ফুটবল খেলতে। কোন দিকে গেলে মাঠ সেইটে জেনে নিয়েই আমি বেরিয়ে পড়লুম। বেশি দূর যেতে হোল না। একটু এগোতেই দেখি একটা টালির চালের ঘর, তাতে দরমার দেয়াল আর তার গায়ে কালো রং দিয়ে মোটা করে লেখা সবুজ সংঘ। তাই বুঝলুম পৌঁছে গেছি। সবুজ সংঘের মাঠটা বেশ বড়। জনা দুই মিলে দেখি মাঠের ধার বরাবর চুনের দাগ দিচ্ছে। মাঠের একপাশের গোলপোস্টের কাছে ছেলেদের জটলা। পল্টেকেও সেখানেই দেখলুম দাঁড়িয়ে আছে। জটলার কাছে পৌঁছে দেখি একটা ছেলে মাটিতে শুয়ে উঃ-আঃ করছে আর বাকিরা কেউ তার মাথায় জল ঢালছে, কেউ বা তাকে বসাবার চেষ্টা করছে। বুঝলুম ছেলেটার বেশ ভালোই চোট লেগেছে। কাছে পৌঁছতেই পল্টে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল। শুনলুম ছেলেটির নাম কাজল। সবুজ সংঘের গোল কিপার। ডান চোখের নিচের অংশ ফুলে চোখ প্রায় ঢেকে গেছে। কর্ণার কিক ধরতে গিয়ে নরেনের, মানে দলের ক্যাপ্টেনের কনুই লেগে এই অবস্থা। সবাই মিলে ধরে করে কাজল কে নিয়ে ক্লাবের চাতালে শোয়ানো হল। সেই সময় আজকালকার মত বাড়ি বাড়ি ফ্রীজ ছিলনা। তাই বরফ বলতে দশ পয়সার কাঠি আইসক্রিমই ভরসা। মাঠে-ঘাটে খেলতে গিয়ে চোট পেলে ওই দিয়েই ফার্স্ট এড হত। তাই আনতে সাইকেল নিয়ে ছুটল দুটো ছেলে। কাজল ভেজা গামছা দিয়ে চোখ ঢেকে বসে ছিল। পল্টে তার কাঁধে হাত রেখে ব্যথা করছে কি না জিজ্ঞেস করতেই কাজল ডুকরে উঠল – 'বাবা বাড়ি ফিরে এ অবস্থা দেখলে তখনই দু ঘা দেবে। আমার আর খেলা হবে না।'"

এই অবধি বলে সত্যেন জ্যেঠু আমার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম "কিন্তু ও তো কিছু অন্যায় করেনি, খেলতে গেলে তো লাগতেই পারে। ওর বাবা রাগ করবে কেন ?" সত্যেন জ্যেঠু বললেন "তখন ব্যাপার স্যাপার ওরকমই ছিল। আগে একপ্রস্থ শাসন, তার পরে খোঁজ খবর। সে যা হোক, কাঠি আইসক্রিম এলে পরে সেটাকে গামছায় মুড়ে কাজলের চোখের তলায় চেপে ধরা হল। তারপর তাকে সাইকেলের সামনে বসিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে গেল একজন। নরেন, দলের ক্যাপ্টেন মনমরা হয়ে বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসেছিল। তার দিকে তাকিয়ে পল্টে করুণ স্বরে বলল 'নরেন দা, কাল কি হবে ?" ব্যাপার হচ্ছে পরের দিন সবুজ সংঘের সাথে তরুণ সাথী ক্লাবের ফুটবল ম্যাচ। সেই জন্যই এত প্র্যাক্টিস, মাঠে চুনের দাগ দেওয়া। দুই ক্লাবে ভালোই রেষারেষি আছে। দু দলেই বেশ কিছু মাতব্বর আছেন। ফি বছর এই ম্যাচ নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়। সবুজ সংঘ আগের বার জিতেছে। তাই তরুণ সাথী এবার মরিয়া বদলা নেবার জন্য। দিব্যি চলছিল সবকিছু, এখন তীরে এসে তরী না ডোবে ! কারণ সবুজ সংঘের আর গোল কীপার নেই। নরেন বিমর্ষ ভাবে মাথা নেড়ে বলল 'কি আর হবে ! আমি গোলে খেলে দেব এখন।' বাকিরা সমস্বরে প্রতিবাদ করতে লাগল।

আমি আর থাকতে না পেরে বললুম 'আমি গোলে খেলে দেব। আমাদের পাড়ার ক্লাবের আমি গোলকিপার।' আমাদের পাড়ায় বুঝলি 'খেলার সাথী' বলে একটা ক্লাব ছিল। ভালোই ফুটবল টিম ছিল আমাদের। যে সময়ের কথা বলছি তখন শিবাজী ব্যানার্জী কলকাতা কাঁপাচ্ছে। পাড়ায় আমার নাম ছিল শিবাজী সতে। এই অবধি বলে সত্যেন জ্যেঠু অন্যমনস্ক হয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন।

আমার এদিকে তর সইছেনা। তাই দেয়াল ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা তিনের ঘর থেকে নয়ের ঘরে এসেছে কি আসেনি তার মধ্যে আমি লুচি আর বেগুন ভাজার তেল লেগে থাকা থালাটা জ্যেঠিমার পাশ কাটিয়ে রান্নাঘরের সিঙ্কে নামিয়ে রেখে, বেসিন থেকে হাত ধুয়ে, হাত প্যান্টে মুছে তারপর সত্যেন জ্যেঠুর সামনে এসে বললাম "তারপর ?" জ্যেঠু হেসে বললেন "সে অনেক কথা, সে সব বলব এখন। কিন্তু শেষ পাতে একটু মিষ্টি যে চাই নীলবাবু।" এই বলে জ্যেঠু "ওগো শুনছ, কিছু একটু ..." এই অবধি সবে বলেছেন, জ্যেঠিমা দুটো ছোট বাটিতে ঘরে তৈরি নারকেল নাড়ু এনে একটা আমার হাতে আর একটা জ্যেঠুর হাতে ধরিয়ে দিয়েই আবার ফিরে গেলেন রান্না ঘরে। যেতে যেতে আমায় বললেন "নীল, এসে জলের গ্লাস দুটো নিয়ে যা।"

এ সব মিটে যাবার পর মৌরি চিবোতে চিবোতে জ্যেঠু আবার শুরু করলেন। "আমার কথা শুনে পল্টে ছাড়া আর কেউ খুব একটা উজ্জীবিত হল বলে মনে হল না। হবেই বা কি করে! কারুর সাথেই তখনও আলাপই হয়নি। পল্টে 'আমার দাদা, হাওড়ায় থাকে, দারুণ খেলে....' এসব বলা সত্ত্বেও কারুর মধ্যেই সেরকম কোনো উদ্দীপনা দেখলাম না। কাজলের বদলে উটকো ছেলে দিয়ে কাজ চালানো হবে, এটা তখনও কেউ মেনে নিতে পারছিল না। আমি বললুম 'তোমরা একটা ট্রায়াল নাওনা। যদি আমার খেলা না ভালো লাগে, তবে না করে দিও, আমি কিছু মনে করব না।' তখনও সবাই কিন্ত কিন্তু করছে দেখে পড়ে থাকা ফুটবল টা নিয়ে একাই ধাপ খাওয়াতে খাওয়াতে গোল পোস্টের সামনে দাঁড়ালুম আর লাফিয়ে বার দুই ক্রসবার টা ছুঁলুম। আমি বেশ বুঝলুম সবাই মন দিয়ে আমায় দেখছে। নরেনই প্রথম উঠে দাঁড়াল। হেঁটে এসে পেনাল্টি বক্সের একটু বাইরে আমার সোজাসুজি দাঁড়াল। আমাদের সময় বুট পরে খেলার রেওয়াজ ছিলনা। কলকাতার ক্লাব ছাড়া বেশির ভাগ জায়গাতেই খালি পায়ে খেলা হত। আমি আমার ফুল প্যান্টের নিচের দিকটা গুটিয়ে নিয়ে হালকা করে বলটা নরেনের দিকে বাড়িয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়ালুম। নরেন অল্প কয়েকটা স্টেপ নিয়ে সোজা আমার দিকে বল মারল। গ্রিপ করতে অসুবিধে হলনা। বুঝলুম ও খুব একটা জোরে মারেনি। দ্বিতীয় শটটা বেশ জোরে কিন্তু সেটাও আমি নিখুঁত গ্রিপ করলাম। বাকিরা ততক্ষণে মাঠে নেমে পড়েছে। গাঁটা-গোঁটা একটা ছেলের দিকে বল বাড়িয়ে দিয়ে নরেন বলল 'কার্ত্তিক মার।' ছেলেটা সর্বশক্তি দিয়ে বলটা মারল। আমি ডান দিকে ঝাঁপিয়ে কোনো রকমে হাতের চেটোটা বলে ঠেকাতে সেটা আর গোলে না ঢুকে বারপোস্টের কাছ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দেখলুম নরেনের মুখে একগাল হাসি। এগিয়ে এসে আমার সাথে হ্যান্ডশেক করে নরেন বলল 'কাল সকাল ন'টা থেকে ম্যাচ। সাড়ে আটটার মধ্যে মাঠে চলে এস। আজ আর বেশি প্র্যাক্টিসের দরকার নেই। এমনিই একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।' বাকিদের সাথে নরেনই আলাপ করিয়ে দিল। প্রতাপ, স্বপন, কালু আর কার্তিক ব্যাকে, রাইট আর লেফট উইং এ জীবন আর মাধব, বলাই আর সমু সেন্টার হাফ, নরেন আর তাপস ফরোয়ার্ড। পল্টে আর সমর এক্সট্রা। টিম সিলেকশন নিয়ে দেখলাম কারুরই কোনো দ্বিমত নেই। সন্ধ্যা প্রায় যখন ঘনিয়ে আসছে তখন এক এক করে ক্লাবের মাতব্বরদের আগমন হতে লাগল। সবারই দেখলাম কালকের খেলা নিয়ে খুব উৎসাহ। মুখের ওপর কিছু না বললেও আমার ওপর যে কারুরই খুব একটা ভরসা নেই সেটা তাদের হাবে ভাবে বেশ টের পেলাম। মনটা খারাপ হয়ে গেল। তরুণ সাথী ক্লাবের মানিক আর পরান দুর্দান্ত স্ট্রাইকার। এবার কাঁচড়াপাড়ার শহীদুলকে তারা আনিয়ে রেখেছে। সে নাকি নামকরা খেলোয়াড়। একসময় কলকাতায় ফার্স্ট ডিভিশন খেলেছে। তাদের সামনে কাজল থাকলে তবু কথা ছিল। কিন্তু এ ছেলেটা ...! নরেন আর পল্টে আমার হয়ে লড়ে গেলেও আমার রোগাপানা ফর্সা চেহারা যে বাকিদের খুব একটা আস্থা অর্জন করতে পারছেনা তা দিব্যি বুঝলুম। ততক্ষণে অন্ধকার গাঢ় হয়েছে। আর দেরি না করে পল্টে কে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলুম। রাস্তায় কোনো আলো নেই। এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় হোঁচট

খেতে খেতে চলেছি। দু পাশের অগভীর নয়ানজুলি থেকে ব্যাঙের ডাক আর ঝিঁঝি পোকার শব্দের মাঝে আমাদের টুকটাক কথাবার্তা বেখাপ্পা রকম জোরালো শোনাচ্ছে। হঠাৎ তীব্র টর্চের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সামনে দুটো লোক কোত্থেকে এসে রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে আমাদের মুখের ওপর আলো ফেলেছে। গ্রাম্ভারী খসখসে গলায় কে যেন বলল 'এই ছোঁড়াটা !' তারপর কিছুক্ষণ সব চুপ। তারপর সেই একই গলার কথা ভেসে এল, 'এ খেলবে ফুটবল ! এতো ননীর পুতুল। খোকা, বাড়ি ফিরে যাও। এখানে তোমার কলকাতার কায়দা চলবে না। খামোখা হাত পা ভেঙে একটা কেলেঙ্কারি করবে। শেষে বদনাম হবে আমাদের গাঁয়ের।' আরও কিছু আপ্ত বাক্য হয়ত শুনতে হত কিন্তু তার আগেই পল্টের গলা পেলাম। 'নিজের কাজে যান কাকা, কার কি ভাঙ্গে কাল বোঝা যাবে।' টর্চের আলো সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখ থেকে সরে গেল পাশে। 'মুখুজ্জে বাড়ির ছোঁড়াটা না ? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা !' ঠিক এই সময়েই পাশে ঝরঝর শব্দ করতে করতে একটা সাইকেল এসে থামল। তারাপদবাবু একবার আমাদের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে সাইকেলে বসে বসেই বললেন 'কি ব্যাপার পরেশ, এত রাতে, এখানে ...' উত্তর এল 'কেন বারণ আছে নাকি ? ছেলেকে খুব তক্কো করতে শিখিয়েছ তারাপদ। ঠিক আছে। কাল দেখা যাবে।' এই বলেই টর্চের মালিক টর্চ নিবিয়ে সঙ্গীকে বলল 'চল', আর তারপরেই হনহনিয়ে দু জনে হাঁটা লাগাল। এর মধ্যেই আমি অবিশ্যি লোকটাকে ভাল করে দেখে নিয়েছি, আবছা টর্চের আলোয় যতটা দেখা সম্ভব। বেঁটে, ঝুঁপো গোঁফ, বাবরি চুল, এই ব্বড় জুলপি, গাঢ় রঙের জামা আর লুঙ্গি পরা, জামার খালি নিচের একটা বোতাম লাগান। পাশের লোকটার বয়স একটু বেশি। লম্বা, খালি গা, কাঁধে গামছা আর পরনে লুঙ্গি। ওদের দিকে একটুও না তাকিয়ে তারাপদবাবু বললেন 'পা চালিয়ে চল দুজনে, ওদিকে পল্টের মা চিন্তায় চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছে।' বাড়ি পৌঁছে হাত-পা ধুয়ে ওপরে উঠতে কাকিমার মুখোমুখি হতে হল। পল্টে যা হোক কিছু উত্তর দিয়ে আমায় নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। আমি জিজ্ঞেস করলাম 'ব্যাপার কি পল্টে ? লোকটা কে ? খেলতে না করছিল কেন ? তুমিই বা ওরকম করে দু কথা শুনিয়ে দিলে যে ...' পল্টে খাটের ওপর বসে পরে বলল 'ও হচ্ছে পরেশ মাল, তরুণ সাথী ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। মাছ ব্যবসায়ী আবার বাজার সমিতির সেক্রেটারি।'

ভীষণ বাজে একটা লোক। পাজির পাঝাড়া। যত রকম দু নম্বরী কাজ হয় সব করে। ওর সঙ্গের লোকটা হরিপদ। ওর শালা। ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পরে জেল খেটেছে। পরেশের সব দুস্কর্মের হাতিয়ার ওই হরিপদ। আগের বার হেরেছে, তাই এবার কোমর বেঁধে নেমেছে। ওর ইচ্ছে আমাদের ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হবে। আমরা তাতে রাজি নই। 'আমাদের ক্লাবের প্রেসিডেন্ট অমিয় জ্যেঠু বাবার বন্ধু, আমাদের স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন একসময়। এখন রিটায়ার করেছেন। পরেশ আমাদের এসে বলে কিনা ক্লাবের পাকা দেওয়াল তুলে দেবে যদি ওকে প্রেসিডেন্ট বানাই। আমরা না করে দিতে সে কি তম্বি! তবে কি জান, আস্তে আস্তে ক্লাবের বড়রা ওর দিকে ঝুঁকছে। আর বোধহয় ঠেকান যাবেনা। সে যাক গে, তুমি বল আমাদের টিম কেমন লাগল ?' খেলা কারুরই দেখিনি, তাই বলার কোনো মানে হয় না। তবু পল্টের মন খারাপ যাতে না হয় তাই বললুম 'বেশ ভালো'। গল্প চলল আরো বেশ কিছুক্ষণ, খাওয়ার ডাক আসা অবধি। ভাত, ডাল, পটল পোস্ত, চিংড়ি দিয়ে ওলের তরকারি আর আমড়ার চাটনি খেয়ে বেশ একটা তৃপ্তির ভাব নিয়ে শুতে এলাম। পল্টে আর আমি একই খাটে। পল্টে একটা ট্রাঙ্ক থেকে ওর খেলার জার্সি আর হাফ প্যান্ট বার করছে আমার জন্য আর আমি সবে ভাবছি এবার লম্বা হব, তারাপদবাবু ঘরে ঢুকলেন। আমাদের দুজনকে একবার দেখে নিয়ে একটুও ভণিতা না করে পল্টেকে জিজ্ঞাসা করলেন 'ব্যাপার কি ? কি হয়েছিল ? পরেশ অমন করে শাসিয়ে গেল যে বড় ! কি করেছিস তোরা ?' পল্টে যা যা ঘটেছে সব কিছু, একটুও না বদলে তারাপদবাবু কে বলে গেল। সব শুনে তারাপদবাবু ভুরু কুঁচকে খানিক্ষণ একমনে কি যেন ভাবলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন 'কাজলকে কে যেন মেরেছে বললি ?' পল্টে বলল 'মারেনি, নরেনদার কনুইটা কোনোরকমে লেগে গেছে, কর্ণার কিক থেকে হেড দেওয়া প্র্যাক্টিস হচ্ছিল, তখন।' তারাপদবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন 'সে যা হোক, গুরুজনের সঙ্গে এরকম ব্যবহার তোমার খুব অন্যায় হয়েছে। কাল সকালে ক্ষমা চেয়ে নেবে।' পল্টে বার দুই 'কিন্তু, কিন্তু ...' বলে চুপ করে গেল। তারাপদবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে পল্টে দমাস করে ট্রাঙ্কের ঢাকনাটা বন্ধ করে গোঁজ হয়ে বসে রইল আমার দিকে পিছন করে। আমি আর কথা না বাড়িয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। বালিশটা একটু টিপে টুপে

ঠিক করে নিচ্ছি, এমন সময় কাকিমার গলা পেলাম 'এত রাতে চললে কোথায় ?' তারাপদবাবু উত্তর দিলেন 'একটু রমেনের সাথে দরকার আছে। এখনই ফিরে আসব।' পাশ ফিরে দেখলাম পল্টে জানলা দিয়ে অন্ধকারে তাকিয়ে আছে, দু চোখে গভীর উদ্বেগ। তারপর চোখের পাতা জড়িয়ে এল ঘুমে।

সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠা আমার বরাবরের অভ্যেস। তাই আজও যখন ঘুম ভাঙল তখন সবে আলো ফুটছে। হাতঘড়ি মাথার কাছেই রেখেছিলুম, দেখলুম সবে পাঁচটা বাজে। পল্টে পাশে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কলঘর থেকে বেরিয়ে দেখি কাকিমা চা নিয়ে চলেছেন গুরুদেবের ঘরের দিকে। আমায় দেখে বললেন 'নিমের ডাল ভেঙে রেখেছি, চট করে দাঁতন করে নাও। আর পল্টে টাকে তোলো। দেরি করে উঠলে আজ আর খাবার সময় পাবে না।' পল্টেকে ঘুম থেকে তোলা এক ঝকমারি কাজ। শেষ অবধি 'এই হুইসেল বাজল, খেলা শুরু ...' বলতে সোজা উঠে বসল। চিঁড়ে, কলা, ছাতু আর সন্দেশ দিয়ে মেখে বেশ পাকা রকম একটা ফলার করে আমি আর পল্টে আমাদের সাজ-সরঞ্জাম গোছাতে বসলাম। পল্টের কাছে বাড়তি হাফ প্যান্ট আর জার্সি ছিল আর আমাদের দুজনের চেহারাও একই রকম। তাই পোশাক নিয়ে কোনো সমস্যা হলো না। রেডি হয়ে গুরুদেবকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোলাম সাড়ে সাত টা নাগাদ। গিয়ে দেখি টিমের সবাই চলে এসেছে। তাছাড়াও আরো বেশ কিছু লোক এসেছে যারা কাল ছিলোনা। মাঠের চারকোনায় রঙীন নিশান লাগান হয়েছে। গণ্যমান্য অতিথিদের জন্য আলাদা করে চেয়ার পাতা। দরমার দেওয়াল আড়াল করে স্টোভে বিরাট কেটলি চাপান হয়েছে। ক্লাবের মেম্বার আর অতিথিদের জন্য গরম চা ফুটছে। টিমের বাকিরাও দেখলাম পৌঁছে গেছে। আজ আর বাকিদের সাথে মিশতে অসুবিধা হলো না। ক্লাবের কর্তা ব্যক্তিরাও এক এক করে আসতে শুরু করেছেন। কাজলও এসেছে। চোখটা ফুলে প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। পল্টে আমার সাথে আলাপ করিয়ে দিতে আমার সাথে হাত মিলিয়ে অতি কষ্টে একটু হাসল বেচারি। সবার ড্রেস করা হয়ে গেলে নরেন আমাদের মাঠের এক কোণে নিয়ে গেল। এখন যাকে বলে 'পেপ টক' সে রকমই কিছু একটা করার মতলব ছিল ওর, কিন্তু কথা শুরু করার আগেই বেধড়ক পটকা ফাটানোর আওয়াজ সব কথা ঢেকে দিল। দেখি অন্তত শ'খানেক লোক নিয়ে মাঠে ঢুকছে পরেশ মাল। চকরা বকরা জামার সাথে সাদা টেরিকটনের প্যান্ট পরেছে, গলায় বেশ বড় একটা গাঁদা ফুলের মালা। কর্তা ব্যক্তিরা কয়েকজন দ্রুত এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। করমর্দন-কোলাকুলির পালা শেষ হলে মাঠের ধারে রাখা চেয়ারে সবাই এসে বসল। এক ছোকরা চায়ের ভাঁড় আর কেটলি নিয়ে সবাই কে চা দেওয়া আরম্ভ করল। আমরা আর দেরি করলাম না। বল নিয়ে মাঠে নেমে পড়লাম।

ওদিকে তরুণ সাথীর টিম আরেক পাশে নেমে গা ঘামাতে আরম্ভ করেছে। কিছুক্ষণ প্রাক্টিসের পর পিঁক পিঁক শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি রেফারি আর লাইন্সম্যানরা এসে পড়েছে। রেফারিকে দেখে টিমের অর্ধেক ছেলের দেখি মাথায় হাত। সে নাকি আগে সবুজ সংঘের হয়ে খেলত। কি একটা গ্রহিত কাজ করায় তাকে আর ক্লাবে ঢুকতে দেওয়া হয়না। সবুজ সংঘের কয়েকজন কর্তা কে দেখলাম উত্তেজিত ভাবে পরেশ মালের সাথে কথা কইতে। এদিকে রেফারি নিজের কাজ শুরু করে দিয়েছে। দু পক্ষের ক্যাপ্টেন কে ডেকে হ্যান্ডশেক করিয়ে তারপর তাদের কাছ থেকে টিম লিস্ট নিয়ে নিয়েছে। এদিকে বাইরে বেশ ভালো রকম একটা গোলমাল পেকে উঠেছে। পরেশের লোকেরা তাকে ঘিরে রয়েছে। সে নিজে বিশেষ বিচলিত হয়েছে বলে মনে হলোনা। দিব্যি পায়ের উপর পা তুলে চেয়ারে বসে রয়েছে। বুঝলুম সে বেশ তৈরি হয়েই এসেছে। এই সব দেখতে দেখতেই রেফারি টস সেরে ফেলল। নরেন ফিরে এসে বলল আমরা ক্লাবের উল্টো দিকের সাইড পেয়েছি। বাকি ছেলেরা রেফারির কথা তুলতেই নরেন মাথা নেড়ে বলল 'ভেবে লাভ নেই। আগের বার আমরা রেফারি দিয়েছিলাম, এবার ওদের পালা। আমরা জান লড়িয়ে দেব, ব্যাস।'

খেলা শুরু হতেই বুঝলুম তরুণ সাথীর খেলোয়াড়দের মধ্যে সেরকম বোঝাপড়া নেই। গুটি তিনেক খেলোয়াড় ছাড়া বাকিরা বেশ আনাড়ি। খেলার চেয়ে গুঁতোগুঁতি করতে তারা বেশি আগ্রহী। কিন্তু তারই মধ্যে এই তিনজন রীতিমত ভাল খেলোয়াড়। দর্শকদের চিৎকার থেকে বুঝে ফেললাম বেঁটে, বাবরি চুলের ছেলেটা শহীদুল, লম্বা, রোগা, মিশমিশে কালো ছেলেটা মানিক আর মাথায় ফেট্টি বাঁধা ছেলেটা পরাণ। শহীদুল বল ধরে প্রতিবারই দু-একজনকে ডজ করলেও আর

কাউকে বল দেবার মত পাচ্ছেনা। সবুজ সংঘের খেলোয়াড়রা মানিক আর পরাণ কে ঘিরে রেখেছে। আর শহীদুলের সাথে ছিনে জোঁকের মত লেগে রয়েছে বলাই আর তাপস। নরেন দু'একবার বল ধরে একাই এগোবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সুবিধা করতে পারেনি। খেলা নিয়ে এত তন্ময় হয়ে ছিলাম যে অন্য কিছু খেয়াল করিনি। হঠাৎ পিছনে চেনা গলার চেঁচামেচি শুনে ফিরে দেখি পরেশ মাল জনা পাঁচেক সাগরেদ নিয়ে গোলের ঠিক পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর সবাই মিলে কটু-কাটব্য আরম্ভ করল একসাথে। আমি বেশ বুঝলুম আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে, খেলার ওপর থেকে চোখ সরে যাচ্ছে বারবার। খেলায় চেষ্টা করেও মন দিতে পারছিনা। এমন সময় আরেক টা চেনা গলা পেলুম আমার ডান দিক থেকে। চমকে তাকিয়ে দেখি সেই পিটপিটে বুড়োটা গোলের জাল ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই আগের মতোই বেখাপ্পা ঢলঢলে মেটে রঙের জামার সাথে নীল চেক চেক লুঙ্গি পরা, হাতে একটা নিবে যাওয়া হুঁকো। বুড়ো বেশ তেজের সঙ্গেই বলল 'মাঠে নেমে বাইরের লোকের কথায় কান দিতে নেই এটা কেউ বলে দেয়নি নাকি ! ওরা জোট বেঁধে এসেছে তোমায় বিরক্ত করবে বলে। এই তালে মানিক কি পরাণ দূর পাল্লার শট নেবে। তুমি ওদের কথায় নাচলে অবধারিত গোল। এইটে ওরা আগে থাকতেই ঠিক করে রেখেছে। বুঝেছ !' আমি এ কথার কোনো জবাব দিলুম না। মনে মনে বুঝলাম কথাটা খুব যুক্তিপূর্ণ। আর ঘটলও তাই। শহীদুল এতক্ষন ডিফেন্স করছিল। হঠাৎ বলাই কে কাটিয়ে বল পাস করল না। ঝড়ের মত উঠে এল বাঁ দিকের উইং দিয়ে। মাখনের ওপর ছুরি চালানোর মতন মাধব আর কার্ত্তিক কে কাটিয়েই বল ঠেলল মানিকের দিকে। মানিক তৈরী ছিল। বল পেয়েই দু পা দৌড়ে সোজা শট নিল গোলে। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম পেনাল্টি বক্সের মাঝামাঝি। মানিক বল পাওয়ার আগেই আবার সেই চেনা গলা পেলাম – 'পিছিয়ে এস, পিছিয়ে এস তাড়াতাড়ি, মানিক ডান পায়ে মারবে, ডান দিকের কোনায়।' কিছু না ভেবেই পিছিয়ে ডান দিক ঘেঁষে পৌঁছতে পৌঁছতে মানিকের শটও এসে পৌঁছল। চল্লিশ গজেরও বেশি দূর থেকে মারা শটে জোর বিশেষ ছিলনা, ছিল নিখুঁত প্লেসমেন্ট। আমার ধরতে অসুবিধা হলোনা। মাঠ জোড়া হাততালি আর গোল পোস্টের পিছন থেকে অকৃত্রিম হা-হুতাশের মধ্যে শট মেরে বলটা মাঝ মাঠে ফিরত পাঠিয়ে ডাইনের গোল পোস্টের দিকে তাকালাম। দেখি বুড়ো ভ্যানিশ ! হাফ টাইম অবধি আর বিশেষ কিছু ঘটল না। হাফ টাইমে মাঠের বাইরে বসে নুন-চিনির জল খেতে খেতে কথা আরম্ভ হল। নরেন এতক্ষণ অবধি প্রায় কিছুই করতে পারেনি। গোটা দুই সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেনি। বলাই আর তাপস মিলেও শহীদুল কে আটকাতে পারছে না। বাকিরা চেষ্টা করছে কিন্তু ওদের সমবেত গুঁতোগুঁতির সঙ্গে পেরে উঠছেনা। আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলাম। নরেন নীচে নেমে এসে কার্ত্তিক কে উপরে তুলে দিক। দূরপাল্লার দু একটা শট ওদের গোলে যাওয়া দরকার। এর মধ্যে তারাপদবাবু এসে দেখা করে গেছেন। সঙ্গে ছিমছাম চেহারার এক ভদ্রলোক। পল্টে ফিস ফিস করে বলল উনিই রমেন বাবু। তারাপদবাবুর বন্ধু। পুলিশে চাকরি করেন, লালবাজারে পোস্টিং। মনে মনে ভাবলাম তাহলে এনার সঙ্গে দেখা করতেই তারাপদবাবু অত রাতে বেরিয়েছিলেন। তার মানে উনি গুরুতর কিছু আশঙ্কা করছেন। এই সব ভাবছি, আবার বাঁশি বাজল। উল্টো দিকের গোলে পৌঁছে দেখি পরেশ তার দলবল নিয়ে আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে। কিন্তু এবার আর অতটা চিন্তা হলোনা। তারাপদ বাবু আর রমেনবাবুও দেখলুম সেখানে অল্প তফাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। রমেনবাবুর উপস্থিতির জন্যেই হয়ত এবার ও পক্ষের আস্ফালন একটু কম। খুক খুক কাশির শব্দ পেয়ে আড় চোখে চেয়ে দেখি বুড়ো আবার হাজির হয়েছে। আমার চোখ তার দিকে দেখেই সে খেঁকিয়ে উঠল 'খেলা তো তোমার সামনে হচ্ছে, চোখ ইদিক উদিক ঘোরে কেন ?' আমি এদিকে মনে মনে ভাবছি পরেশ আর তার লোকজন যদি বুড়োর কথা শুনতে পায় তাহলে বেচারিকে আস্ত রাখবে না। পরেশরা কি জানি কেন বুড়ো কে কিছুই বলল না। এদিকে সেই বুড়ো বকেই চলেছে। 'ওরা এবার যেটা করবে সেটা হল পেনাল্টি বক্সের কাছে এসে আছাড় খাবে। শহীদুল চমৎকার ফ্রী কিক মারে। ওরা সেই সুযোগ টা নেবে এবার। তৈরি থেক।' আর হলোও তাই। মানিক আর পরাণ নিজেদের মধ্যে স্কয়ার পাস খেলে সেন্টার লাইন ক্রস করে খানিকটা এগিয়ে এসে আবার একটু পিছিয়ে থাকা শহীদুলকে পাস দিল। শহীদুল বল ধরেই গতি বাড়াল। সমু কে ডজ করতেই সামনে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা কিন্তু তাও সে এগোল না। থ্রু পাস বাড়াল কার্ত্তিক আর নরেনের মাঝখানে থাকা মানিকের দিকে। কার্ত্তিক মানিকের কাছ থেকে বল নেবার চেষ্টা করতেই মানিক কি রকম হাত পা ছুঁড়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। রেফারি অমনি বাঁশি বাজিয়ে সেখানে ছুটে এসে কার্ত্তিকের ওপর তম্বি আরম্ভ করল। বাইরে বেশ চেঁচামেচি হচ্ছে কিন্তু সে সব রেফারি গ্রাহ্যি করল না। গোল থেকে প্রায় ত্রিশ

গজ দূরে ফ্রী কিক পেল তরুণ সাথী ক্লাব। আমি গোল লাইনে এসে দাঁড়ালুম ডান দিক ঘেষে। বাঁদিক ঘেসে নরেন দাঁড়াল। চারটে ছেলে ওয়াল তৈরি করেছে। বাকিরা বক্সের ভিতর ওদের খেলোয়াড়দের গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়েছে। ছোট খাটো ধাক্কা ধাক্কি চলেছে। শহীদুল শট নেবার জন্য তৈরি হল। আমি আবার বুড়োর গলা পেলুম। 'অদ্দুর থেকে শটে জোর থাকবেনা। তোমার গ্রিপিং ভালো। তাই তোমার দিকে মারবেনা। ও মারবে নরেনের দিকে উঁচু করে। মনে রেখ নরেনের কাছে পৌঁছবার আগেই তোমায় ধরতে হবে।' বুড়োর আগের পরামর্শ গুলো এতই ঠিক ছিল যে আমার মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না। শহীদুল বাঁশি বাজার পর হালকা পায়ে দৌড়ে এসে চিপ করল আর বলটা অল্প বাঁক খেয়ে সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরতি পায়রার মত বাঁ দিকের ক্রস বারের দিকে উড়ে এল। তৈরি ছিলাম আর তাই তিন চার পা ছুটে গিয়ে গোল লাইনের অল্প আগে লাফিয়ে বলটা নিখুঁত গ্রিপ করলাম। তারপর কিক করে পাঠিয়ে দিলাম ওদের দিকে। মাঠের চারদিকে একটা মিশ্র কোলাহল উঠল, তবে সেটা হল ক্ষণস্থায়ী। সবুজ সংঘের সব সমর্থক একসাথে গর্জন করে উঠেছে। আমার কিক করা বল সেন্টার লাইন পার করে একবার ধাপ খেয়ে ওদের দুজন ডিফেন্ডারের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে। গড়িয়ে যাওয়া সেই বলের দিকে প্রাণপন ছুটেছে কার্ত্তিক। ওদের গোলকিপার বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছিল, সেও পড়িমরি করে ছুটেছে গোলের দিকে। তাড়া করে আসা দুজন ডিফেন্ডারের আগেই কার্ত্তিক পৌঁছল বলের কাছে আর চলতি বলেই শট মারল ওদের গোলে। গোলকিপার তখনও পৌঁছতে পারেনি গোল লাইনে। 'গো ও ও ল' । সামনে ছুটলাম দলের বাকিদের সাথে। কার্ত্তিক ততক্ষণে আদরে-আলিঙ্গনে ঢাকা পড়ে গেছে।

নিজের গোলে ফিরে এসে দেখলাম বুড়ো বেপাত্তা। বেপাত্তা পরেশ মাল আর তার শাগরেদরা। একটু দুশ্চিন্তা হল। বুড়োটাকে ধরে নিয়ে যায়নি তো! অবিশ্যি তারাপদবাবু আর রমেনবাবুর তখনও সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাদের সামনে কিছু করতে গেলে নিশ্চয়ই বাধা দিতেন। আবার খেলা শুরু হল। শহীদুল ওপরে উঠে এসেছে। তার খেলা দেখে বুঝলাম বাকিদের ওপর সে আর ভরসা করছেনা। সে বুঝে গেছে যে করার তাকে একাই করতে হবে। তার দলের বাকিরাও বুঝে গেছে খেলে তারা জিততে পারবে না। অতএব তারা বেধড়ক হাত-পা চালাতে আরম্ভ করল। কার্ত্তিক, সমু, জীবন চোট পেল। কিন্তু রেফারি কিছুই দেখতে পায়না। সবুজ সংঘের ছেলেরাও চুপ করে থাকার পাত্র নয়। তারাও পাল্টা মার আরম্ভ করল। এবার বাঁশি বাজতে লাগল ঘন ঘন। মাঠের বাইরে ততক্ষণে দু পক্ষের হাতাহাতি শুরু হয়ে গেছে। গুঁতোগুঁতি মারামারি সবই চলছে মাঝমাঠে, গোল অবধি বল আসছেনা। হঠাৎ আবার সেই বুড়োর গলা পেলুম। ঘুরে দেখি সে উবু হয়ে বসে রয়েছে গোল পোস্টের ধারে। 'কথা হচ্ছে এবারের কাজটা কিন্তু শক্ত হতে চলেছে খোকা, বুঝলে।' বললে বুড়ো। আমি কান খাড়া করে শুনতে থাকলুম। 'এবার ওরা ওদের শেষ চেষ্টাটি করবে। পেনাল্টি বক্সের ধারে কাছে বল এলে তৈরি থেক।' পিছন ফিরে যে কিছু জিজ্ঞেস করব তার জো নেই। তাই চুপ করে রইলুম। তরুণ দল কর্ণার পেল একটু পরেই। ফার্স্ট বার এ কালু, আমি সেকেন্ড বার এ দাঁড়ালুম। শহীদুল কর্ণার কিক নিতে গেল। পেনাল্টি বক্সে দু পক্ষের মধ্যে ধাক্কা ধাক্কি শুরু হয়ে গেছে। শহীদুলের কিক হাওয়ায় ভেসে বক্সে ঢোকা মাত্র আমি এগিয়ে গিয়ে লাফ দিলাম। বলটা যখন প্রায় হাতের মুঠোয় এসে গিয়েছে ঠিক তখনই কে যেন পিছন থেকে জার্সি ধরে টান দিল আর আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। বলটা আমার হাতে লেগে মানিকের বুকের কাছে যেতেই ও সেটাকে হেড দিল সোজা গোলের দিকে। আর কালু গোল লাইনে দাঁড়িয়ে বুক দিয়ে বলটাকে আটকে কোনো রকমে শট মেরে বাইরে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু রেফারি বাঁশি বাজাচ্ছে কেন ? মাটি থেকে উঠে দেখি মহা গোলমাল লেগে গেছে। রেফারি পেনাল্টি দিয়েছে। কালু নাকি হ্যান্ডবল করেছে। মারপিট হতে হতে হলোনা কারণ দু'পক্ষেরই কয়েকজন কর্তাব্যক্তি মাঠে ঢুকে কোনো রকমে পরিস্থিতি সামাল দিলেন। রেফারির ডিসিশনই বহাল রইল। বুকের ধুকপুকুনি সামলে তৈরি হলুম। ওদের পুরো টিম গোলকিপার শুদ্ধ উঠে এসেছে। বার দুয়েক লাফিয়ে ক্রস বার ছুঁয়ে গোল লাইনে দাঁড়িয়েছি সবে, বুড়োর গলা পেলুম। 'শহীদুলের অভ্যেস শট মারার আগে ও নিজে বলটাকে ভাল মত বসিয়ে নেয়। আর বসাবার সময় যে দিকে মারবে, সে দিকটা আড়চোখে একবার দেখে নেয়। ওর চোখের দিকে খেয়াল কর।' বুড়োর গলা শুনে নার্ভাসনেসটা একটু যেন কমল। শহীদুল রেফারির বসানো বলটা আরেকবার ভাল করে বসিয়ে চোখ তুলে গোলের দিকে তাকাল, চোখের মণি দুটো অলসভাবে একবার বাঁদিকে ঘুরল তারপর আমার দিকে সোজা

তাকাল। আমি ততক্ষণে বুঝে ফেলেছি আমায় কি করতে হবে। হাল্কা পায়ে ছুটে এসে শহীদুল নিশ্চিন্ত ভাবে শট নিল বাঁ দিকের পোস্ট লক্ষ্য করে। নিচু, গড়ান শটটা আমার বাঁ হাতের মধ্যমাকে বেশ ভাল রকম জখম করে পোস্টের বাইরে চলে গেল। মাটিতে শুয়ে শুয়ে দেখলাম শহীদুল অবাক চোখে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। খেলা চলল আরও মিনিট পাঁচেক। রমেনবাবুর গলা পেলাম । উনি রেফারির দিকে তাকিয়ে বেশ উঁচু গলায় বললেন 'ফটিক, আমি কিন্তু ঘড়ি দেখছি।' অমনি রেফারি বাঁশি বাজিয়ে খেলা শেষ করে দিল।

মাঠ থেকে ক্লাব অবধি ফিরলাম এর তার কাঁধে চড়ে। পিঠ চাপড়ানীর চোটে পিঠে ব্যাথা করছে। পল্টে গিয়েছিল কাঠি আইসক্রিম আনতে। সে এলে পর অর্ধেক আইসক্রিম তাকে দিয়ে বাকিটা রুমালে মুড়ে বাঁ হাতের মধ্যমায় চেপে ধরে বসে রইলুম। ক্লাব থেকে আজ খেলোয়াড়দের মিষ্টি খাওয়ানো হবে। তারই তোড়জোড় চলছে। অল্পবিস্তর সবাই আহত। টুকটাক শুশ্রূষা আর ম্যাচের রোমন্থন দুইই চলছে একসাথে। তারাপদবাবু অভিনন্দন জানিয়ে বলে গেছেন বাড়িতে মাংস হচ্ছে, আমরা যেন বেশি দেরি না করি। মিষ্টি-টিস্টি খেয়ে, উঠি উঠি করে শেষ অবধি বেরোতে আরও ঘন্টাখানেক লাগল। সবারই অনুরোধ দুদিন থাকার জন্য। আমারও মনখারাপ লাগছিল। কয়েকঘন্টা একসাথে লড়াই করে বাকিরা যেন বহুদিনের পরিচিত বন্ধু হয়ে গেছে। বিকেলে আবার আসব কথা দিয়ে বাড়ির পথে হাঁটা লাগালাম।

আকাশে খুব মেঘ করেছে। চারিদিক কালো হয়ে এসেছে। আমি পল্টে কে বললুম 'বাড়ি ঢোকার আগে একটু হাত-পা ধুয়ে গেলে হয় না রে। সারাগায়ে যা ঘাম আর ধুলো ...' পল্টে বলল যাবার পথে একটু ঘুরে গেলে রায়দের পুকুর। সেখানকার জল নাকি পরিষ্কার। তাই আমরা সেই পুকুরের দিকেই গেলুম প্রথমে। বেশি দূর যেতে হলোনা, ভাঙা পাঁচিল চোখে পড়ল। তার ভিতর দিয়ে পায়ে চলা পথ ভিতরে ঢুকে গেছে। সেই পথের দু ধারে বড় বড় ঝুপসি গাছ আঁধার করে রেখেছে জায়গাটা। বিছুটি আর আলকুশির ঝোপ এড়িয়ে খানিক দূর যেতেই কাদের যেন গলা পেলুম। চাপা কিন্তু স্পষ্ট স্বর। আমরা দুজনে মুখ তাকাতাকি করে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম। বেশ পুরোনো একটা আমগাছের কাছে পৌঁছতেই সামনেটা খানিক পরিষ্কার হয়ে গেল। দেখি হাত দশ বার দূরে নরেন আর পরেশ মাল দাঁড়িয়ে কথা কইছে। পরেশের কাছেই আরও দুটো ছেলে দাঁড়িয়ে। পরেশ বলল 'টাকা ফেরত দে।' নরেন মিনতির সুরে বলল 'আমার যা করার তাতো করেছি। তোমার লোক পেনাল্টি মিস করলে আমি কি করব।' কথার উত্তর এল সপাট চড়ে। এত জোরে শব্দ হল যেন পটকা ফাটল। নরেন দু' পা পিছিয়ে গিয়ে নিজের গাল চেপে ধরল। 'কে বলেছিল ওই ছোকরা কে টিমে নিতে ? কাজল কে সরালি কেন তাহলে ? বরঞ্চ কাজল খেললে আমরা ঠিক জিততাম। কাপ্তেনি করিস আর আর এটুকু বুঝিস নি ? হারামজাদা !' আমি আর পল্টে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছি আর ধীরে ধীরে আমার কাছে সব পরিষ্কার হচ্ছে। কাজলের চোট পাওয়া, ফার্স্ট হাফে সুযোগ পেয়েও গোল না করা আর শেষ বেলায় পেনাল্টি বক্সে আমার জামা ধরে টেনে নামিয়ে আনা – সব কিছু তাহলে সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে ! আমার মন হঠাৎ নিষ্ঠুর আনন্দে ভরে উঠল। খাক মার, আরও মার খাক। এই মার ওর প্রাপ্য। পল্টের হাত ধরে পিছিয়ে আসতে যাব এমন সময় কে যেন আমার ঘাড় চেপে ধরল। এত জোরে যে আমি ব্যাথায় ককিয়ে উঠলাম। পল্টেরও একই অবস্থা। তারপর হিঁচড়তে হিঁচড়তে টেনে নিয়ে চলল সামনে। পরেশ মাল কথা থামিয়ে এদিকেই তাকিয়ে ছিল। আমাদের দেখে তার মুখে বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। যে লোকটা আমাদের ধরে ছিল সে আমাদের ধাক্কা মেরে ফেলে দিল মাটিতে। ঘাড় রগড়াতে রগড়াতে তাকিয়ে দেখি পরেশ মালের শালা হরিপদ। বলিহারি গায়ের জোর ! দু'দুটো জোয়ান ছেলেকে বিড়াল বাচ্চার মতন ঘেটি ধরে নিয়ে আসা যে সে লোকের কাজ নয়। পরেশ মাল পল্টের দিকে তাকিয়ে বলল 'মুখুজ্জে বাড়ির ছেলেটা না ? খুব লম্বা চওড়া কথা কইতে শিখেছ। আড়ি পাতছিলে ? আমার নামে নালিশ করবে ?' তারপর হা হা করে খুব খানিক হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল 'তা বাপু ননীর পুতুল, খুব খেল দেখালে আজকে। তা আমাদের গাঁয়ে এসেছ যখন, একটু জল তো খেয়ে যাবে।' তারপর হুঙ্কার ছাড়ল 'চোবা দুটোকে।' হরিপদ আর বাকি দুটো লোক একসাথে এগিয়ে এল আমাদের দিকে। এবার অবিশ্যি কাজটা সোজা হলনা। আমরা খানিক ধস্তাধস্তি করলুম বটে কিন্তু লাভ হলো না। ওরা আমাদের হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল ঘাটের দিকে। তার মধ্যেই শুনে ভাল লাগল নরেন কাকুতি মিনতি করছে পরেশের কাছে আমাদের ছেড়ে দেবার জন্য। পরেশ মাল প্রচন্ড এক ধমক দিয়ে

নরেনকে চুপ করিয়ে দিল। ঘাটের প্রথম ধাপে পৌঁছে হরিপদই প্রথম দেখল, তারপর আমি। ঘাটের রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই বুড়ো। হরিপদ যে অবাক হয়েছে সেটা ঘাড়ের ওপর চাপ একটু আলগা হতে বুঝলাম। সে ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল 'তুমি আবার কে হে ? কেটে পড়, কেটে পড়।' বুড়ো কিন্তু নড়ল না। পরেশ মালের গলা পেলাম। হাসতে হাসতে বলল 'দাদু কি যাত্রা দেখছেন নাকি ? মানে মানে কেটে পড়েন নইলে আপনাকেও চোবাব।' বুড়ো দেখি তাও নড়ে না। আমার বেশ ভয় করছিল। সাঁতার জানি, জলে চুবলে কষ্ট হবে আমাদের কিন্তু প্রাণে বাঁচব। কিন্তু এই বুড়োকে যদি জলে চোবায় তাহলে নির্ঘাৎ মৃত্যু।

বুড়ো কিন্তু একদৃষ্টে তাকিয়েই রইল হরিপদর দিকে। এদিকে টিপ টিপিয়ে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তারই মধ্যে কি করে যেন বুড়োর হুঁকোর কলকেটা দপ করে জ্বলে উঠল। তারপর সেই আগুন ছেয়ে গেল তার চোখে, মুখে, গলায়। জ্বলন্ত চোখে বুড়ো ফিসফিসিয়ে বলে উঠল 'আমায় ধরবি? আয়, কাছে আয়।' আঁ আঁ করে চিৎকার আর তারপরেই ঘাড়ের চাপ একবারে আলগা হয়ে গেল। পড়িমরি করে হরিপদ দৌড়েছে। পিছনে পরেশ মাল আর তার চেলারা। দূর থেকে ধপাস করে আছাড় খাওয়ার শব্দ আর মরিয়া আর্তনাদ ভেসে এল। পরেশ মাল চিৎকার করছে 'ওরে আমায় ফেলে যাসনে।' আমি অবাক হয়ে দেখলুম পল্টে গড় হয়ে বুড়ো কে প্রণাম করল। বুড়োর মুখে দেখলুম একটু যেন হাসির ছোঁয়া।

নরেন খুব ভয় পেলেও আমাদের ফেলে পালায় নি। পরেশ কে আমরা ফেলে চলে আসতে পারলুম না। তার ডান হাঁটু উল্টো দিকে ঘুরে গেছিল। এছাড়া তাকে যখন আমরা কোনো রকমে দাঁড় করালুম, সে ম্যালেরিয়া রুগীর মত কাঁপছিল। তিন জন মিলে অতিকষ্টে পরেশকে রাস্তায় এনে তুললুম। তারপর একটা ফাঁকা রিকশায় পরেশ আর নরেন কে তুলে দিয়ে আমরা বাড়ির পথ ধরলুম। যেতে যেতে পল্টে আমায় জিজ্ঞাসা করল 'সতে দা, তুমি যে ভয় পেলে না বড় !' আমি তখন পল্টেকে সব বললুম। ওদের বাড়িতে ঢোকার পর থেকে খেলার শেষ অবধি। পল্টে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল 'উনি হচ্ছেন সুবল দাদু। আমার দিদার কি যেন সম্পর্কে ভাই হতেন। বাড়ির একজন হয়ে গেছিলেন। আমাদের নিচের তলার ঘরে থাকতেন। দাদু-দিদা মারা যাবার পর আমরা যখন এখানে থাকতে এলাম, ওনার মনে খুব ভয় হয়েছিল। যদি আমরা থাকতে না দি ! মা ওনাকে খুব ভক্তি করত। বাবা ওনাকে কথা দিয়েছিল উনি আমৃত্যু এখানে থাকতে পারেন, আমাদের অসুবিধে হবেনা। টুকটাক ব্যবসা করতেন, সামান্য রোজগার। তাই দিয়েই চেষ্টা করতেন সবার জন্য কিছু না কিছু করার। ফুটবল খেলার খুব নেশা ছিল। প্রায়ই কলকাতায় যেতেন খেলা দেখতে। ওকে দেখেই আমি মোহনবাগান সাপোর্টার হয়েছি। শুনেছি নিজেও নাকি খেলতেন একসময়। বছর আটেক আগে কয়েকদিনের জ্বরে মারা গেলেন। আমরা বেশ টের পাই উনি যে আমাদের ছেড়ে যাননি। তবে উনি কক্ষণো কাউকে কিছু বলেন না, কারুর ক্ষতি করেন না। মা নিচের ঘরটা তালাবন্ধ করে রেখেছে, মাঝে মাঝে ঝাড়পোছ করে এই অবধি। উনি যেমন ছেড়ে গেছিলেন এখনও তেমনি সব রাখা আছে।'

পরের দিন সাত সকালে পল্টে রিকশা এনে হাজির করেছে। সাড়ে আটটার মধ্যে শেয়ালদা পৌঁছোতে হবে শুনে গুরুদেব বেশ তাড়াহুড়োই করছেন। আমি গুরুজনদের প্রণাম-টনাম করে নীচে নেমে এলাম। বন্ধ দরজার সামনের চুনকাম করা দেওয়ালটার দিকে ফিরে চোখ বন্ধ করে প্রণাম করে মনে মনে বললাম 'আজ আসি। আবার আসব।' সামনের শূন্যতা থেকে চেনা স্বর ভেসে এল 'এস বাবা। দুগ্গা, দুগ্গা।'

রজত ভট্টাচার্য, নিভৃত সাহিত্যচর্চা আর দূর্গম পাহাড়ে ভ্রমণ তাঁর ভালোলাগা। গদ্য ও পদ্যে সমান দক্ষ। পেশায় কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মী। তাঁর গদ্যের অভিনব শৈলী বিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে।

ধারাবাহিক

মমতা দাস (ভট্টাচার্য)

আব্দুল চাচার লড়াই

পর্ব ৪

রোজ আসি আব্দুল চাচার বাড়ি। সকালে উঠে কোনমতে কাজকর্ম সেরে, সাড়েদশটার মধ্যে হাজীর ! অফিস যাত্রীদের স্রোতের উল্টোদিকে আসি বলে, বাসে আসতে কোনো অসুবিধাই হয় না। প্রায় রোজ-ই উঠেই বসার সিট পাই, মাঝে মাঝে একেক দিন শুরুতে দাঁড়াতে হলেও, দু-একটা স্টপের পরেই বসার জায়গা পাই। কোনদিন আসার সময় হাতে করে একটু মিষ্টি, না হয় ফল নিয়ে আসি, মাঝেমাঝে পটেটো চিপস, লেহের কুরকুরে – তারপর তিনজনে চায়ের সঙ্গে মজা করে খাই! জানি এটুকু কিছুই না, তবু ওরা তো রোজ চা-মুড়ি-ছোলা ভাজা, কুমড়োফুলের, সজনে ফুলের বড়া এসব খাওয়ায়, আমার খারাপ লাগে, তাই এটুকু ! একেকদিন চাচা-চাচি বলে দেয় – 'কাল খেইয়ে এইস্য না দিদি, গরিবের ঘরে দুটো ডাইল-ভাত খেইও কেনে !' – আমি সানন্দে রাজী। তাদের আন্তরিক নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারি না, চাইও না অবশ্য! কেমন যেন একটা আন্তরিকতার বাঁধন তৈরী হয়েছে, মনেই পড়ে না এরা আমার অচেনা ছিল কদিন আগেও ! এখন এদেরকে আত্মার আত্মীয় বলে মনে হয় ! মনে হয়, মানুষের সম্পর্ক আসলে বেশি গভীর হয় মনের মিল হলে, রক্তের সম্পর্ক থাকলো কিনা কিছু আসে যায় না তাতে ! আমার কত আত্মীয় আছে, যাদের সঙ্গে মনের, মতের কোন মিল-ই নেই, কেবল অভ্যাসে সম্পর্ক টেনে যাওয়া, তাতে অন্তরের আনন্দ কই? আমি আবার মাঝে মাঝে একেবারে অমিলের লোকজনকে ছাঁটাই করি আত্মীয়-বন্ধুদের তালিকা থেকে, আমার জীবন থেকেও ! তারপর আব্দুল চাচাদের মত সত্যি মানুষগুলোকে কাছে টানি। ধনী-গরিব, কম-বেশি বয়স, শিক্ষিত-নিরক্ষর কিছুতে এসে যায় না, মনের মত মানুষ হলেই হল ! আর পেয়েও যাই কিন্তু ! আছে এক ছোট্ট চা-দোকানি দাদা, আছে বিসলেরির জল সাপ্লাই দেওয়া ছেলে, আছে বাড়িতে বিক্রি করতে আসা আচারওয়ালি মাসিমা, আছে পাড়ার টেলর বোন আরো কত ! মনের জায়গা কখনো খালি থাকে না। যাকগে, যা বলছিলাম ! এই দোষ, এক কথা বলতে গিয়ে আরো কত কথা বলতে লাগি ! আগের কথায় ফিরি আবার, যেদিন খাওয়ার নেমন্তন্ন থাকে, সেই দিনগুলোয় চাচা রিক্সা নিয়ে বেরয় না, আমার অনারে ছুটি নিয়ে নেয়। না, বিশ্রামের জন্য নয়, আমাকে বারুইপুর ঘোরাবে বলে। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে, রুটি-তরকারী খেয়ে একদম রেডি হয়ে থাকে আমাকে রিক্সায় বেড়াতে নিয়ে যাবে বলে। আমি পৌঁছে এক কাপ চা খাই, তারপর চাচিকে ঝোল-ভাত রেডি রাখতে বলে বেরয় আমাকে নিয়ে। সেসব দিনগুলোতে আগে চাচা বাজার থেকে বড় মাছ আনত, তারপর যখন জানলো আমি চারাপোনা, ছোট মাছ, কুচো চিংড়ি ভালবাসি, তখন তাদের আনন্দ দেখে কে ? চাচার আনন্দ বেড়েছে যেদিন আমি তাকে জানিয়েছি আমিনাকে নিয়ে, তাদের লড়াইটাকে নিয়ে আমার গল্প লেখার ইচ্ছার কথা !

বলেছে – 'লেখো দিদি লেখো। সব মেয়ের কতা লিখ্যে দাও। কেবল আমার আমিনা-ইতো নয় দিদি, গ্রামের ঘরে ঘরে কত মেয়ে যে মার খাচ্ছে পড়ে পড়ে, তার হিসাব নাই। এই তো কয় বছর আগে আমিনা তখন সেভেন-এ পড়ে, ইস্কুল থেইক্যে এসে মনমরা ঘুইরে বেড়ায়, কতা কম কয়, তার মন বুঝা কঠিন কাজ। আমরা ভাইবতে লাগলাম মেয়ের হইল্যটা কি ? ওর মা কয়, 'পড়া পারেনি, মাস্টারনি বৈক্যেছে নিচ্চয়' – আমি ভাবি, আমার মেয়েইটা ন্যাকাপড়ায় ভাল, পড়া না পারার জইন্য বকা ? উঁহু, কতা আচে কিচু ! 'কাচে ডেইক্যে শুধোতে কইলো, বন্ধু আবিদা-র নাকি বিয়া ঠিক হৈছে, আবিদার মন খারাপ, বিয়া কইরতে চায় না এখন, বাড়ির লুক শুনেই না ! ঐদিন-ই শেষ ইস্কুলে আসা তার, সবকটা মেয়ে নাকি গলা জড়াজড়ি কইরে কানছিল ইস্কুলে, এখন-ও মনটা খারাপ তার লেইগ্যে ! খুব রাগ হৈয়ে গেল দিদি, ঐটুকু মেইয়াটার বিয়া দেয়, কেমুন মা-বাপ ?' – কথা শেষ করে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে চাচা, তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, – 'মেইয়াটা নাই দিদি, ওর থেক্যে কুড়ি বছরের বড়, তিন বিয়ার মানুষটার সন্তান জন্ম দিত্যে গিয়ে মইরে গেল !' কাঁধের গামছাটা দিয়ে চোখ মোছে আব্দুল চাচা, আমার-ও মনটা খারাপ হয়ে যায় ! কিন্তু তার পর-ই চমকে উঠি চাচার কথায় –

'কিন্তু সেই রাগটা রাইখতে পারলাম কি দিদি, তিন বচর পর নিজেও তো সেই ভুল কৈরলাম, মেয়্যাটারে বলির পাঁঠা কইরে, বিয়া দিলাম লুকের কতায়, সমাজের চাপে মেইয়েটার কতাই ভুইল্যে গেলাম !' – এবার হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে চাচা, আমার মনটাও কেঁদে উঠল একজন অসহায় বাপের কান্না দেখে ! আমাদের দেশের ঘরে ঘরে এমন কত আবিদা-আমিনা আর তাদের মা-বাপ কাঁদছে, স্বাধীনতার এত বছর পর-ও লেখাপড়ার জন্য এই কান্না, ভাবা যায় না ! রাস্তার পাশে একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় রিকশা দাঁড় করিয়ে কথা বলছিলাম আমরা। রাস্তা দিয়ে লোক যাচ্ছে পায়ে হেঁটে-সাইকেলে-রিক্সায়, তারা অবাক হয়ে দেখছে এক ফিটফাট মহিলার রিক্সায় বসে থাকা আর বৃদ্ধ রিক্সাওয়ালার আকুল কান্না বেশ কৌতূহলের উদ্রেক করেছে দেখলাম। দু-একজন থেমে ইতস্তত করছে, এগিয়ে আসবে কিনা ভাবছে। আমি স্তব্ধ বসে থাকি, কি-ই বা করতে পারি ? একজন অসহায় বাপকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমার জানা নাই ! কিছুক্ষণ কেঁদে মুখটা মুছে নেয় আব্দুল চাচা। যারা জড়ো হয়েছিল আশেপাশে, লজ্জার হাসি হেসে তাদের বলে – 'কিছু নয় গো দাদা, আমার এই দিদিটার সাথে দুটো সুখ-দুঃখের কতা কই, তা একেক সময় চোকে জল এইস্যে যায়' – তারপর আবার রিক্সা টানতে আরম্ভ করে। আমি মনে মনে ভাবি – 'এই মনের জোর আছে বলেই লড়ে যাচ্ছে এই নিরক্ষর চাষী তার মেয়ের লেখা-পড়ার জন্য ! প্রণাম করতে ইচ্ছা করে এমন মানুষকে !

এর মধ্যে বারুইপুর সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারছি। কলকাতার এত কাছে এইসব সমৃদ্ধ জায়গা সম্মন্ধে আমরা কিছুই জানি না, অথচ দেশ-বিদেশের ইতিহাস-সংস্কৃতি সম্পর্কে কত খোঁজ রাখি ! আজকাল নতুন করে জানছি বারুইপুরকে, আমার বেশ লাগছে। একদিনে নয়, এক চাচাও নয়, কয়েকজন মিলে জানাচ্ছে টুকরো টুকরো ইতিহাস, আমি মনের ভিতর রাখছি, গোছাচ্ছি সেগুলোকে, বেশ লাগছে। রিক্সায় ঘুরতে ঘুরতে আমার যখন মনে হয়, চাচা ক্লান্ত, তখন তাকে থামতে বলি, তার বিশ্রামের কথা বললে তো থামবে না, তাই আমার চায়ের তেষ্টার কথা বলি, হা হা হা করে হাসে আমার ফোকলাচাচা বলে – 'এইটুক ঘুইরে আমার দিদির কেলান্তি হয়, চা তেষ্টা পায়।তা হবেনা সুখের শরীর যে ! আমাদের মত ক্ষেতে খাটা চাষীর ঘরের মানুষ তো নয় !' – হাসে কিন্তু রিক্সা থামায়। হয় তো পরিচিত চায়ের দোকান, হয় তো না। আমি কোনোদিন রিক্সায় বসেই চা খাই, সঙ্গে স্থানীয় বিস্কুট। আবার কোনোদিন নেমে বসি দোকানের বাইরে রাখা বেঞ্চ-এ। এখন সূর্যের তাপ কম, বাতাসে শীতের ছোঁয়া, গাছের ছায়ায় পাতা বেঞ্চে বসে উপভোগ করি আলো ঝিলমিল রোদের আল্পনা, আমার গায়ে পড়েছে জাফরী কাটা রোদ, একটা মধুর উত্তাপ ছড়িয়ে যায় শরীর জুড়ে, বেশ লাগে ! আরো দু-চারজন পথ চলতি লোক এসে বসে, দাঁড়ায়, চা খায়, গল্প জমে ওঠে। চায়ের দোকানীও যোগ দেয়, এরা স্থানীয় লোক, এখানকার কথা বলে। আব্দুলচাচা আর আমি দুই বহিরাগত মুগ্ধ হয়ে শুনি, বেশ লাগে ! জানতে পারলাম রায়চৌধুরীরা ছিল এখানকার পুরানো জমিদার বংশ। খুব রমরমা ছিল। এখানকার বিখ্যাত 'কাছারীবাজার' তাদের-ই পত্তন করা। সেই ইংরেজ আর নবাবের আমলে। আজ-ও আছে সেই বাজার। কি পাওয়া যায় না ? জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠের সব জিনিস পাওয়া যায়। আরো শুনি এখানে রায়চৌধুরী বাড়িতে খুব বড় করে দুর্গাপুজো হত, সেটাই ছিল এখানকার সবচেয়ে বড় পুজো। আরও কয়েকটা পুজো হত তখন। দশমীর দিন ভাসান হত। সব ঠাকুর একদিনেই ভাসান হত। তবে নিয়ম ছিল প্রথমে জমিদার রায়চৌধুরীদের বাড়ির প্রতিমা ভাসান হবে, তারপর একে একে অন্যদের ঠাকুর ভাসান হত !

আরেকদিন শুনলাম বারুইপুরের গাজনমেলার কথা। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে শিব পূজা উপলক্ষে খুব বড় গাজনের মেলা হত। বহু দূর দূর থেকে দর্শনার্থী এসে জড়ো হত। সেই উপলক্ষে লাঠিখেলার আয়োজন হত বিরাট করে ! লাঠিয়ালদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, রেষারেশি হত খুব ! একবার নাকি বড়িশার জমিদার সাবর্ণ চোধুরী আর বারুইপুরের জমিদার রায়চৌধুরীদের লাঠিয়ালদের মধ্যে রেষারেষি চরমে ওঠে। এই দুই জমিদারের মধ্যে জমিদারির সীমানা নিয়ে বিবাদ ছিল বহুকালের ! সেদিনের লড়াই তাই প্রায় যুদ্ধের চেহারা নেয়, শেষ অব্দি বারুইপুরের রায়চৌধুরীদের লেঠেল সর্দার একটা তরোয়াল দিয়ে সাবর্ণ চৌধুরীদের সর্দারের গলা কেটে মাথা নামিয়ে ফেলে। লাঠিখেলার সেখানেই ইতি ! কিন্তু লোকে সেটা ভালো মনে মেনে নেয় নি ! সাবর্ণ রায় চৌধুরীর লাঠিয়াল সর্দারের নাম ছিল ভৃগুরাম, সে খুব জনপ্রিয় ছিল। তার হত্যার পর জনতা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। পরে তার ঝাঁকড়া চুলের একটা গুচ্ছ কেটে রাখ হয় এবং স্মৃতি হিসাবে

রক্ষিত হয়। এখন-ও নাকি প্রত্যেক বছর বারুইপুরের বিখ্যাত গাজন মেলার সময় সেটাকে দ্রষ্টব্য বস্তু হিসাবে রাখা হয়। শুনলাম রায়চৌধুরীদের বাড়ির পাশেই আছে রাসের মাঠ। সেই আমলে ওখানে বিখ্যাত রাসের মেলা হত। জমিদার বাড়ির মদনমোহন – সেই মেলার আরাধ্য দেবতা, এবং অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন ! আজও নাকি মেলা বসে, তবে ততটা জনক-জমক নেই, বলাই বাহুল্য ! জমিদার রায়চৌধুরীদের কুঠিবাড়ি নাকি এখন-ও আছে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জেলাধিকারী, তখন তিনি নাকি চৌধুরীদের এই কুঠিবাড়িতেই থাকতেন ! তবে সেসব শোনা কথা, স্থানীয় লোকরাও সত্য/মিথ্যা জানে না। আধুনিক যুগেও বারুইপুরের গুরুত্বের কথা শুনলাম। এখানেই নাকি অপারেশন-এর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরীর রমরমা ব্যবসা ছিল। বেশির ভাগ হাসপাতালে প্রাধনত এখান থেকেই যেত সেসব সরঞ্জাম ! মাঝে বেশ কিছুদিন এই ব্যবসায় ভাঁটা পড়েছিল নানা কারণে, আবার আজকাল আরম্ভ হয়েছে পুনঃ প্রত্যাবর্তন ! শুনে খুব ভালো লাগল ! প্রায় সব ব্যবসায়ী তো বাংলা থেকে নিজেদের ব্যবসা গুটিয়ে সরে গেছে রাজনৈতিক এবং উনিয়নবাজির কারণে, তবু যদি বারুইপুর ! বারুইপুর আধুনিক বাংলার জীবনে গুরুত্ব পূর্ণ আরো কিছু কারণে, এখানকার টাটকা শাক-সব্জী নাকি কলকাতার বাজারের বিশেষ আকর্ষণ ! আর বারুইপুরের পেয়ারার কথা কেই বা না জানে ? শাসন ব্যবস্থার দিক থেকেও বারুইপুরের গুরুত্ব বাড়ছে ক্রমেই। এটাকে রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানীর মর্যাদা দিতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সেলিম গোষ্ঠীকে বিল্ডিং সোসাইটি তৈরী করার জন্য যে জায়গা দেওয়া হয়েছিল, সেটা আবার ফিরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেটা হলে বাংলার ভৌগোলিক ম্যাপে বারুইপুরের গুরুত্ব আরো বাড়বে। শিয়ালদা থেকে মাত্র পঁচিশ কিলোমিটার দূরে গড়ে উঠবে রাজ্যের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর !

এভাবেই চাচার সঙ্গে বেড়িয়ে, নানা গল্প-ইতিহাস জেনে সময় কাটে বেশ, আমার কৌতূহলী মন পছন্দের খোরাক পায়। কিন্তু মনের গভীরে আমিনার আর আব্দুল চাচার লড়াই-এর ভাবনাটা চলতেই থাকে। নানারকম কথার মধ্যে কিন্তু আমরা আমিনার জীবনের গল্প থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। সেটাই তো আসল গল্প ! সেটা বলার জন্যই বসেছি লিখতে। তবে আবার ফিরি সেই কাহিনীতে ! আমিনার বন্ধু গোলাপী প্রায়-ই যায় আমিনার শ্বশুর বাড়িতে। আত্মীয়তা সূত্রে সেখানে তার অবারিত দ্বার। ইদানিং অবশ্য মনে হয় যেন ওই পুরো পরিবারটার-ই একটা রাগ রাগ ভাব তার উপরে ! কেন, কারণ গোলাপী আমিনার বন্ধু। সে বন্ধুর ঘরে যাবেই, তার সঙ্গে আবার পড়ার বাহানা আছে ! আটকানো যায় না। কে জানে কি গল্প হয় দুই বন্ধুর ! সারাক্ষণ পাহারা দেওয়া যায় না ! এবাড়ির লোকের এইসব পড়া পড়া ঢং একেবারে ভাল লাগে না, কেমন যেন মনে হয় এই বাহানায় ওই মেয়েটা গোলাপী তাদের ঘরের খবর জানতে আসে, আবার বাইরে গিয়ে বলে বেড়ায় কিনা কে জানে ! অবশ্য বলে বেড়ালেও খুব ক্ষতি নেই, তারা বড় লোক জোতদার, তাদের উপর কথা বলবে কার সাহস আছে ? সে ভয় নেই, তবে মনে মনে একটা বদনাম তো বটেই ! এইসব সাত-পাঁচ ভাবে সেবাড়ির লোক, মনে মনে গজরায়, কিন্তু মুখে কিছু বলে না ! চেষ্টা করে যদি কোনোভাবে মেয়েটার আসা বন্ধ করতে পারে। আজকাল শরবৎ, কোনো খাবার কিচ্ছু দেয়া হয় না, তবু-ও নাছোড়বান্দা মেয়েটা আসবেই। এনসব গরিব আত্মীয়দের মেয়েগুলো এইরকম-ই গায়ে পড়া, আসলে তালে থাকে, যদি একটু খাবার না অন্য কিছু পাওয়া যায় ! গোলাপী মেয়েটা অবশ্য একটু আলাদা, কি যে চায় কিছু বোঝা যায় না, একটা-দুটো কথার পর-ই – 'না যাই আমিনার কাছে পড়া বুঝে নিই গা, দেরী হই যেইছে' – বলেই ঢুকবে গিয়ে বদমাশ অবাধ্য বৌটার ঘরে। এইসব বিদ্যাবতী ন্যাকা মেয়েগুলোকে দুচোখে দেখতে পারে না জোতদারের বাড়ির লোক, কিন্তু বেশি কিছু বলাও যায় না, সক্কলেজেনে যাবে তারা বৌ-এর পড়া-লেখার বিরোধী, আজকালকার দিনে সে বড় লজ্জার কথা ! তাই রাগ হলেও মেনে নিতেই হয় গোলাপীর আসা-যাওয়া, বাধা দেওয়া যায় না ! যদি জানতে চাও আমিনা বদমাশ কেন ? উত্তর নেই, এ-ওর মুখের দিকে চায় ! কি উত্তর দেবে ? আমিনার মত নির্বিরোধী, শান্ত, ভালোমানুষ মেয়ে গাঁয়ে আর একটাও নেই সেটা যে সকলেই জানে ! কাজেই। ওদিকে আমিনা আর গোলাপী লেখা-পড়া করে বটে, আবার নানা গল্প-ও করে। আর একটা পরামর্শ। সেটা কেউ জানে না তারা দুজন ছাড়া ! না আরেকজন জানে, ইস্কুলের হেড স্যার। কবে পরীক্ষার ফরম ভর্তি করতে হবে, সেসব খবর গোলাপী এনে দেয় আমিনাকে। হেড স্যার তার উপস্থিতির খাতাখানা ঠিক রাখেন। এত দিনে এরা সকলেই বুঝে গেছে শ্বশুর বাড়ির লোকরা আমিনাকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে

দেবে না কিছুতেই ! একটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, একটা জেদাজেদির পাল্লাপাল্লি ! একটা ছোট্ট মেয়ের সঠিক চাওয়ায় এই জেদাজেদিতে যে তাদের মান বাড়ে না সেটা বোঝায় কে ? অর্থ-প্রতিপত্তির মিথ্যা অহং মানুষকে অন্ধ করে দেয় । এমনিতে আমিনাকে নিয়ে বাড়িতে কোন ঝামেলা নেই । শান্ত, নির্বিরোধী মেয়ে, অবাধ্যতা তার স্বভাবেই নেই ! কোন বিষয়ে কোন অভিযোগ জানানো-ও তার ধাতে নেই, যা খেতে দাও, যেমন রাখো তাতেই রাজি । বড় লোকের বাড়ি এমনি কোনো খাওয়া-পরা-থাকার অসুবিধা কিছুই নাই, কাজকর্ম-ও সব করার লোক রাখা আছে, তাহলে আর কি অভিযোগ করবে আমিনা ? তাই চুপকরে থাকে, কিন্তুসেটা বোঝে কে ? আসলে আমিনার সবকিছুই এখন ক্রমে তাদের অপছন্দের ব্যাপার হয়ে উঠেছে – 'শহুরে কাইদার বিদ্যেবতি মেয়েইয়ে গুলার ঢং ইসব ! যেন বিদ্যেটাই আসল, খেইলো না খেইলো উদের কিচু হয় না । পড়া-লিখা জানে যে ! খাই খাই করে গাঁয়ের লুকে, উরা করে না । ইস্টাইল গো ইস্টাইল' একজন বলে অন্যরা সব মাথা নাড়ে, মুখ ব্যাঁকায় । মাঝে মাঝে জোর দেখিয়ে শাসন, মাঝে মাঝে মিষ্টি কথায় বোঝানো, এমনি নরম-গরমে দিন কাটে আমিনার । একেকদিন বাড়ির গুরুজন মহিলারা তাকে বোঝায় মেয়ে মানুষ লেখাপড়া শেখে বিয়ের জন্য, তা তার তো বিয়ে হয়েই গেছে, এমনতেমন নয় অতি বড়লোক বাড়িতে । এই লেখাপড়া করার বায়নার জন্য ঘরে-সংসারে কত অশান্তি!জিদটা ছেড়ে দিলেই আমিনার স্বামীও তার বশ হবে, আর মারধোর অশান্তি করবে না ! আমিনা চুপ করে শোনে, কথার জবাব দেওয়ার অভ্যাস তার নাই ! এরা ভাবে বুঝলো বুঝি, কিন্তু ওমা আবার দেখি বইপত্র নিয়ে বসে ! তাহলে আর তারা কি করবে ? 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী', সোহরের হাতে মার খাওয়াই ভবিতব্য ! আজকাল রোজ মার খায় আমিনা, কারণ সেই একটাই, লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার জিদ সে ছাড়বে না, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সে দেবেই ! ওর বর ফজলুর রহমানের জেদ বৌকে পরীক্ষা সে দিতে দেবে না ! যেন একটা চ্যালেঞ্জ, কে জেতে তার-ই পাল্লাপাল্লি!

এইসমস্ত ঘটনার নীরব সাক্ষী জসিমুদ্দিন, যখন তখন বাড়ির ভিতরে ঢোকার অনুমতি কেবল তার-ই আছে ! পুরুষ চাকর আর কেউ ভিতরবাড়িতে ঢুকতে পারে না, জেনানা মহল যে ! আসলে জসিমুদ্দিনতো ঠিক চাকর নয়, এরশাদ-এর পালিত পুত্রের মত, তার মা আত্মহত্যা করার পর, তার বাপ যখন পাগল হয়ে গেল, তখন জসিমুদ্দিনকে নিয়ে এসে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেয় এরশাদ ! তার নিজের ছেলে ফজলুর-এর সঙ্গে খেলা-ধূলা করেই বড় হয়েছে সে ! তবে তফাৎ কি ছিল না? ছিল, ঈদের সময় ফজলুরের জামা-কাপড় আসত কলকাতার বড় দোকান থেকে, একটা তো নয়, দামী দামী, আর কত রকমারি ! জসিমুদ্দিনেরটা আসত চাকরদের সঙ্গে গ্রামের হাট থেকে, শস্তা ছিটের কাপড়ের জামা ! যখন ছোট ছিল, বুঝত না, খুব কান্নাকাটি শুরু করত ফজলুরের মত জামা চাই বলে, তারপর দু-একটা চড়-থাপ্পড় খাওয়ার পর কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ত ! একটু একটু করে বড় হয়েছে, আর ধীরে আসল তফাৎ টা বুঝতে পেরেছে ! ফজলুর এবাড়ির ছেলে, আর সে ছেলের মত চাকর ! তবুও তার প্রাণ বাঁচানোর কৃতজ্ঞতায় সে কেনা হয়ে থাকত এরশাদের কাছে ! সেতো ভেসেই যাচ্ছিল, বাঁচার কোন আশাই ছিল না, তখন তুলে এনে তাকে বড় করেছে এরশাদ, পরে জসিমুদ্দিন শুনেছে বাড়ির মহিলাদের খুব আপত্তি ছিল, কিন্তু এরশাদের উপরে কথা বলার সাহস ছিল না তাই হেলা-চ্ছেদ্দা করে খাবার, জামা-কাপড় দিয়েছে তারা, জসিমুদ্দিন বড় হয়ে উঠেছে ! বড় হয়েছে ফজলুরের সঙ্গেই, কিন্তু ফজলুর যখন স্কুলে গেছে, সে তখন বাড়ির গরু-ছাগল চরিয়েছে, মুরগীর ডিম তুলেছে, খাবার দিয়েছে সব পশু-পাখিকে ! এভাবেই দুই বন্ধুর পথ ধীরে আলাদা হয়ে গেছে ! ক্রমে বন্ধু নয়, চাকর আর মনিবের সম্পর্ক হয়েছে তাদের ! অথচ ফজলুরের থেকে বুদ্ধি কম ছিল না জসিমুদ্দিনের, কিন্তু ফজলুরের বাপের পয়সা ছিল, আর তার তো বাপ-ই নেই ! ফারাক তো আছেই, বিস্তর ফারাক ! তবুও দিন কেটেই যাচ্ছিল, কিন্তু –

একদিন অমবস্যার গ্রামে বিদ্যুত নাই, চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, ইলেকট্রিক লাইট-এ যদিও আলো তেমন হয় না, তবু কিছুটা তো ভাল ! আর একটা অভ্যাসের-ও ব্যাপার তো থাকে ! তা সেদিন আলো নেই, গরম-ও বেশী, তাই এরশাদ তার দলবল নিয়ে খামারবাড়ির উঠোনে বসেছে আড্ডা মারতে ! কেউ একজন পাখার হাওয়া করছে, কেউ জল গড়িয়ে দিচ্ছে ! জসিমুদ্দিন সেদিন ক্ষেতের শাকসব্জী, ফলমূল নিয়ে হাটে গেছিল, সারাদিন ঘুরে ক্লান্ত সে শুয়ে পড়েছে, ঘরের গরমে টিঁকতে না পেরে, কখন সে মাদুর নিয়ে এসে বারান্দায় শুয়েছে, কেউ লক্ষ্যই করে নি ! ঘুমাচ্ছিল সে, হঠাৎ নিজের

নামটা কানে যেতে কান খাড়া করে সে! ভিড়ের মধ্যে কেউ একজন হেসে বলে – 'জসিমের মা যদি থাকত এই সময়, একটু আনন্দ পাওয়া যেত' – আরেকজন যোগ করে – 'সত্যি একখান শরীল ছেল বটে ! খুব মজা করেছিলে ওই কয়দিন, তাই না কত্তা ?' – 'আরে দুর' এরশাদের গলা বেজে ওঠে – 'সে শালী তো কাপড়-ই খুলতে চাইত না, তার জন্যই তো জোর করে, খামার বাড়িতে বন্ধ রেখে, কদিন ভোগ করলাম ! ধ্যুত, তাতে কি পুরা মজা হয় ?' – থুক করে একদলা থুতু ফ্যালেসে ! কান খাড়া করে জসিমুদ্দিন, অবাক হয় সে, নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না ! এরমধ্যেই আরেকজন বলে ওঠে – 'আর দশ/বারোদিন পরে ছাড়া পেতেই, শালী একেবারে গলায় দড়ি দিল ? কি মানুষ বল, মেয়েমানুষের আবার এত মান কিসের, তায় আবার গরিবের ঘরে' ! আরেকজন যোগ করে – 'আর তোকে ভোগ করল কে, তোর বড়লোক মালিক, জীবন ধন্য হয়ে যাওয়ার কথা তোর ! তা না, সুইসাইড আশ্চর্য' – আর মরদটাকেও দ্যাখো, বউ গলায় দড়ি দিয়ে গাছে ঝুলে পড়তেই, পাগল হয়ে গেল ? বোকা নাকি লোকটা ? আর এরশাদ সাহেবতো বলেই ছিল মাইনে বাড়িয়ে দেবে, বউ-এর মাইনেটাও তাকে দেবে, বোকা শুনলো কি ? রেগেমেগে কাজ-ই ছেড়ে দিল, তারপরই পাগল ! আরে ছেলেটার কথাতো ভাব-ভাগ্যিস এরশাদ সাহেব ছিল, তাই ছেলেটা ভেসে যায়নি, মরেনি ! এই এরশাদের দয়ায় সে বেঁচে আছে ? যে তার মাকে আটকে রেখে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে ভোগ করেছে কদিন ! পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে শুনতে থাকে জসিমুদ্দিন ! সেই কুঁজ-ওয়ালাবুড়ি তাহলে ঠিক-ই বলেছিল ? সে কিন্তু তাকে ধমকে ধামকে চুপ করিয়ে দিয়েছিল ! ভিখারী বুড়ি কি বলতে কি বলছেভেবে, গুরুত্বই দেয় নি কোন ! বিশ্বাস সেদিন-ও হয় নি, আজ-ও হচ্ছেনা ! কিন্তু এরাতো পুরা ঘটনাই আলোচনা করছে, মজা পাচ্ছে সকলে ! তার মাকে নিয়ে মজা ! রাগে গা জ্বলে যায় তার ! কি করবে ভেবে পায়না ! শক্তিমানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়া তো সহজ নয় ! এই সেদিন-ও এরশাদ তাকে বলেছে – 'সেই ছুট্টবেলায় বাপ-মাকে হারিয়ে, তুই তো মরেই যেইছিলি ! আমি দেখে দুঃখে মরি, আহারে ছোট্ট বাছা, মা-বাপ দুইজনই গেল, বাঁচে কেমনে ? তখন তুলি আনলাম, তোরে বড় করলাম ! আজ তুই আমার সহায়, তুই সাথে থাকলি, কুথাও আমার ভয় নাই জানি!' – এরশাদ বলেছে, আর সে কৃতজ্ঞতায় গলে গেছে ! আর আজ একি শুনল ? ঘেন্নায় গা রি রি করছে তার ! এখন থেকে তার একটাই কাজ, মা-বাবার অপমান, মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া !

সেদিন থেকে জসিমুদ্দিন সব লক্ষ্য করে ভাল করে ! বাড়ির ভিতরের, বাইরের সব কিছু, আর সুযোগ খোঁজে প্রতিশোধ নেওয়ার ! এতদিনে তার খেয়াল হয়, এ বাড়ির লোকরা আমিনার সঙ্গে কি ব্যবহার করে ! বাড়ির বউ-এর সঙ্গেও কাজের লোকের মত ব্যবহার করে তারা ! আর সকলে বিরক্ত তার উপর, কেন না মেয়েটা পড়তে ভালবাসে, পড়তে চায় ! তাতেই তাদের আপত্তি ! বোঝ ব্যাপার, লোকে খুশি হয় কেউ পড়তে চাইলে, আর এরা ? পড়তে চায় বলে, বৌটার উপর কি অত্যাচার ! বদমাশ লোকগুলোর সব-ই কি উল্টো হয় ? আর ফজলুর ? কোথায় গর্ব হবে, বউ লেখাপড়ায় এত ভাল, সাত গাঁয়ের লোকে নাম করে, তা না বৌকে ধরে পেটায় ! লজ্জাও করে না ! আর বৌটা ? বিনা দোষে মার খায়, অত্যাচার সয়, তবু মুখের হাসি মোছে না, কি দিয়ে তৈরী কে জানে ! নাকি লেখাপড়া শিখলে এমনি হয়, ভিতরের জোরটা বাড়ে ? জানে না জসিমুদ্দিন, ভাবতেই পারে না ততটা ! কিন্তু ক্রমেই তার রাগ বাড়তে থাকে, মনে মনে প্রতিশোধের আগুনের তেজ বাড়ে !

এদিকে আমিনার গল্প এগোচ্ছে তার মত, যথা সময়ে ফর্ম ফিলাপ, কি ভাবে কি হল, সেও এক রহস্য ! আমিনা তো বাড়ির বাইরেই যায় নি, অথচ ঠিকঠাক সব হয়ে গেছে ! বাড়ির লোক মুর্খ হওয়ায় সুবিধা হয়েছে, তারা যা ভাবতে পারে না, তাই করা যায় ! একমাত্র ফজলুর ধরতে পারত হয় তো, কিন্তু তার সময় কোথায় ? বউ-এর পড়া বন্ধ করার খবরদারি, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, আশপাশের দু-তিনটে গ্রামের মেয়েদের উত্যক্ত করা, কাজ কি একটা ? তাছাড়া আমিনার বুদ্ধির কাছে তার বুদ্ধি তো কিছু না ! আমিনা গোলাপীকে দিয়ে হেড স্যারের কাছে কি অনুরোধ পাঠিয়েছে, তিনি কি ব্যবস্থা করেছেন, সেসব বোঝা ফজলুরের ক্ষমতার বাইরে ! কি করে গোলাপীর হাত দিয়ে ফর্ম পাঠিয়েছেন হেড স্যার, সেটা ফিলাপ করে, নিজের বাবার কাছে পাঠিয়েছে আমিনা, আবদুল কখন ফর্ম আর পরীক্ষার ফি-র টাকা নিয়ে গিয়ে স্কুলে জমা করল, সেসব অনেক বড় গল্প ! ফজলুর-এর কল্পনার এত ভাবার শক্তি নাই ! এই প্রসঙ্গে গোলাপীর কথাটাও না বললে নয় ! খুব নরমসরম মিষ্টি মেয়ে গোলাপী, যেমন সুন্দর নাম, তেমনি যেন তুলতুলে মেয়ে ! কিন্তু মনে নিশ্চয় শক্তি আছে, যেভাবে

সে আমিনার পাশে দাঁড়িয়েছে, অভাবনীয় ! সাধারণ ঘরের অতি সাধারণ এক মেয়ে, লেখাপড়ায় মোটামুটি, তার এত মানসিক জোর, অবিশ্বাস্য ! বিপদের ভয় তো আছেই, তার উপরে আত্মীয় সমাজে বদনাম, নিন্দামন্দ, কিছুর কমতি হবেনা আমিনার পরীক্ষাপাশে তার ভূমিকা জানাজানি হলে ! তার বাবাও এতটা বোঝেনি, ভেবেছে আগে যেমন পড়ত আমিনার কাছে, তেমনি ! জায়গা বদলেছে আমিনার, মানুষটাতো সেই এক-ই !গোলাপী গেছিল আমিনার খবরাখবর নিতে, সঙ্গে নিজের-ও একটু পড়া, তারপর ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়েছে পুরো ঘটনায় ! না বুঝে নয় কিন্তু ! আমিনা পাশ করার পর যখন সব ঘটনা জানাজানি হয়ে গেল, তখন কলকাতার টিভি চ্যানেলের লোকরা এসে তার সঙ্গে কথা বলেছে, তাদের প্রশ্নের উত্তরে ক্যামেরার সামনে নির্ভয়ে বলেছে গোলাপী – 'করেছি আমিনার জন্য যতটা পারি ! কিন্তু কেবল আমিনা নয়, গাঁয়ে-ঘরে যত মেইয়ে আছে, যাদের দাবিয়ে রাখা হয়েছে, লেখাপড়া না করিয়ে অন্ধকার জীবন দেওয়া হচ্ছে, সেইসব মেইয়ের কথা ভেইব্যে আমি আমিনাকে সাহায্য করিছি ! আমরা পড়ব, আলো দেখব, বাঁচব মানুষের মত ! বিয়ে, সন্তানজন্ম দেওয়া এই কি শুধু মেয়েদের জীবন ? বইতে কত কি লেখা আছে, কত গল্প-কবিতা-ইতিহাস-বিজ্ঞান-ভ্রমণ কত কি ? বই না পড়লে জানব কি করে ? ওই যে দিদিমনিরা আমাদের পড়ায়, তারা নিজেরা পড়ে, পাশ করে তবে তো আমাদের পড়াচ্ছে ! কতকি জানে, জানায় সকলকে ! আমি তো ঠিক করেছি, পাশ করে আমিও দিদিমণি হওয়ার চেষ্টা করব' – সাংবাদিক বলেছে – 'তোমাদের গ্রামে তো খুব কম ছেলেরাও লেখাপড়া করে, ওই তো ফজলুর, একটা পাশ দিয়েই বিয়েটিয়ে করে ফেলেছে,আর পড়ার ইচ্ছাই নাই ! তার অবশ্য দরকার নেই, বাপের পয়সা খায় কে তার ঠিক নাই' ! পয়সার কথা শুনে ফোঁস করে উঠেছে গোলাপী, শুধু পয়সা রোজগারের জন্য কি লেখাপড়া ? কত কি জানা যায় বই পড়লে, জীবনের মান উন্নত করা যায় – কে বলছে এসব কথা ? গ্রামের অতি সাধারণ এক মেয়ে, যে একটু লেখাপড়া শিখেছে ! এসব গল্প আবদুল চাচার কাছে শুনি আর ভাবি, এইগুলোই তো লেখাপড়ার গুণ ! যেটুকু পড়েছে, তাতেই এতটা বুঝেছে, আরো পড়লে আরো তো হবেই ! এভাবেই জ্ঞান মানুষের চোখ খুলে দেয় ! শিক্ষা মানসিক চোখ খুলে দেয়, আর তাদের বেঁধে মারা যায় না, অন্ধকারে আটকে রাখা যায় না ! তাই কি সমাজ, রাজনীতি চায়না মানুষ লেখাপড়া শিখুক ! শুধু তো মেয়েরা নয়, আমার দেশের সত্তর শতাংশ লোক-ই তো অক্ষরজ্ঞানহীন ! স্বাধীনতার পরে অর্ধ শতাব্দীর বেশী পার হয়ে এসেও, দেশে লেখাপড়ার তেমন বিস্তার কই ? পড়া মানেই জানা, জানলেই মনে নানা প্রশ্ন জাগে, প্রশ্ন জাগলে তার তো কোন সীমা থাকে না, এটাসেটা হতে হতে নিজেদের প্রাপ্য স্বাধীনতা, অধিকার এসবের হিসাব আর পাওয়ার বাসনা জাগে ! তখন-ই ক্ষমতাবানদের বিপদ ! লুটেপুটে খাওয়ার অসুবিধা, শিক্ষাকে সাধারণের যত নাগালের বাইরে রাখা যায়, ততই ভাল ! তাই যুদ্ধের খাতে টাকা বেশী বরাদ্দ করা হয় শিক্ষার খাতের চেয়ে !অথচ দেখা যাচ্ছে গোলাপী যত সাধারণ-ই হোক তার গলাতেও প্রত্যয়ের সুর এনেছে, এমন-ই গুণ শিক্ষার !

সে যাই হোক, গোলাপী আর হেড স্যারের সৌজন্যে আমিনার ফর্ম ফিলাপ হল, আমিনার বাবা আবদুল সেটা স্কুলে জমা দিয়ে দিল, এরা কয়েকজন ছাড়া কাক-পক্ষী ঘুনাক্ষরেও টের পেলনা ! তারপর তিনমাস কেবল পড়া ! গোলাপী আসুক না আসুক আমিনা সারাক্ষণ লেখাপড়া করে ! বাড়ির লোক বিরক্ত হতে হতে এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে ! এইসব 'লেখাপড়া জানা ন্যাকা মেয়েগুলোর' সঙ্গে পারেনা বলেই হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয় বিরুদ্ধবাদীরা ! তাতে ভালই হয় আমিনার, নির্বিবাদে পড়তে পারে সে ! কাজের লোকগুলো তাকে ভালবাসে, কেবল লেখাপড়ার জন্য নীরবে মা-র খেতে পারে যে মেয়ে, তার প্রতি একটা সমীহ মেশানো শ্রদ্ধা আছে তাদের, তাই তারাই খাবার পৌঁছে দেয় আমিনার ঘরে ! আমিনা কোন অভিযোগ করেনা বলে তাদের একটা বাড়তি স্নেহ আছে এই ছেলেমানুষ মেয়েটার প্রতি ! এভাবেই হয়, হওয়া স্বাভাবিক, উচিত-ও ! যখন ক্ষমতাবানরা দুর্বলের উপর অকারণ অত্যাচার করে, তখন নির্বল মানুষ দল বাঁধে, প্রতিরোধের জন্য একাত্ম হয়, প্রথমে ভয়,তারপর আসে ক্রোধ, অত্যাচারিতের প্রতি করুণা, মায়া ! তখন-ই দিন বদলের সংকেত !

আমিনার ফরম ফিলাপ করা হয়ে গেছে, পরীক্ষার অনেক দেরী, কিন্তু হঠাত দেখা গেল আমিনার বেশ শরীর খারাপ !কি যে হয়েছে বলতে পারে না, অথচ খেতে-শুতে, এমনকি বসে থাকতেও ভাল লাগেনা তার ! দিনের বেশিরভাগ সময় শুয়েই থাকে, পড়ে, কিন্তু শুয়ে শুয়েই ! তা সে শুয়ে থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই, কাজকর্ম তো কিছু করতে হয় না ! আর এত

ভাল তাকে এবাড়ির কেউ বাসেনা যে, শুয়ে থাকলে বিচলিত বা চিন্তিত হবে ! অতএব শুয়ে থাকে আমিনা!কথাটা কাজের লোকদের মধ্যে আলোচনা হতে হতে আমিনের বাবা আব্দুলের কানে পৌঁছে যায় ! না, ঠিক উড়ো খবরের মত নয়, জসিমুদ্দিন খবরটা গোপনে পৌঁছে দিল আব্দুলের কাছে সঙ্গে অনুরোধ তার নামটা যেন এরশাদের কানে না যায় ! কৃতজ্ঞ আবদুল কেনই বা এসব নিয়ে কথা চালাচালি করবে ? মেয়ের অসুখের খবর পেয়েছে, কোনো চিকিতসার ব্যবস্থা আমিনার শ্বশুরবাড়ির লোক করেনি, সেটাও জেনেছে – সেসব নিয়েই সে চিন্তিত, ঝামেলা বাড়াতে সে চায়না ! শুক্রবার মসজিদের নামাজ শেষ হলে, মৌলবী মশাই-এর সঙ্গে কথা বলে কি করা উচিত তাই নিয়ে ! মৌলবী আমিনার বড়লোক শ্বশুরকে মানে, পয়সা কথা বলে কে না জানে ! সে বলে, তেমন অসুখ হলে কি আর জানা যেত না ? মেয়েমানুষের কতরকম কি হয়, তার কি ঠিক আছে ? তারপর আব্দুলের গম্ভীর মুখ দেখে প্রমাদ গোনে, এই মানুষটাকেও চটানো যায় না, চাষীদের মধ্যে বেশ প্রভাব আছে এর কথার ! সৎ, সোজাসাপ্টা মানুষ, এদেরকেও খুশি রাখা দরকার ! নানা কথা ভেবে আবার বলে আবদুল যদি চায়, একজন ডাক্তার নিয়ে যেতেই পারে, মেয়েতো তার, ওরা বাধা দিতে পারবে না ! আর দেবেই বা কেন, তারা তো আর আমিনাকে মেরে ফেলতে চায়না ! আমিনার ওই বিশ্রী পড়া পড়া জেদটাই তো সব নষ্টের গোড়া ! নইলে ওরা তো পছন্দ করেই আমিনাকে ঘরে নিয়ে গেছে' – কি যে হবে এত পড়ে, কে জানে ! আজকালের মেয়েদের এসব ফ্যাশন, খাওয়াপরার অভাব নাই, কোনদিন চাকরী করতে হবে না,তবুও' – বিড় বিড় করতে করতে চলেযায় মৌলবী !

আবদুল চলে গোলাপীর বাবার সঙ্গে কথা বলতে, তারা তো দুই পক্ষের-ই আত্মীয়, এমন লোককে সঙ্গে নিলে ব্যাপারটা শোভন হয়, বাড়াবাড়ি মনে হবে না ! হাজার হোক মেয়ের শ্বশুরবাড়ি ! গ্রামের লোক, আত্মীয়পরিজন কারো চোখে অশোভন কিছুই করতে চায় না আবদুল ! গোলাপীর বাবা মুস্তাফা কামাল এরশাদের আত্মীয় বটে, কিন্তু এরশাদ একে বড়লোক, তায় অহংকারী, দুর্বিনীত এমন লোককে এড়িয়ে চলাই সমীচীন বোধে সে একটু দুরত্ব রেখেই চলে ! তাছাড়া তার বড় মেয়ে ফিরোজা-র বিয়েটা এরশাদ একরকম জোর করেই নিজের সম্পর্কিত ছোট ভাই-এর সঙ্গে দিতে বাধ্য করে, এরশাদের কাছে তখন বিরাট ঋণ ছিল মুস্তফার, কিছুতেই এড়াতে না পেরে পনেরো বছরের ফিরোজার বিয়ে দিতে হয় চল্লিশ বছরের বদরু মিঁয়ার সঙ্গে, যার কিনা আগের একটা বউ ছিল ! মানুষটাও ভাল ছিল না ! আগের বউ গায়ের ঝাল মেটাতে ফিরোজাকে দিয়ে ঘরের সব কাজ করাত, চাষীর ঘরে কাজ তো কম নয় ! সারাটা দিন কাজ করে এলিয়ে পড়ত মেয়ে, ঠিকমত খেতেও দিত না তারা ! তাবলে কি জরুর শরীর ভোগ করা ছাড়বে বদরু? ছোট্টমেয়েটার প্রায় জান যায় যায় ! বদরুকে দু-একবার বলেছে মুস্তফা, সে শয়তান দাঁত বের করে হাসত, বলত 'আরে আব্বাজান, এসব আমার ঘরের কথা, বাইরের লোক হইয়া ক্যান মাথা ঘামান ?' তারপর এরশাদকেও বলেছিল, সেও এক-ই কথা বলে, 'ঠিক কথাই তো কৈসে বদরু, উয়াদের ঘরের কথা, তুমি ক্যান মাথা ঘামাও ?' তারপর তো তার আদরের মেয়েটা বাচ্চার জন্ম দিতে গিয়ে মরে বেঁচে যায় ! কিন্তু সেই থেকে এরশাদের উপরে তার রাগ ! এদিকে আবদুল তার সম্পর্কে ভাই হলেও আসলে বন্ধু ! মানুষটাও ভাল, সহজ-সরল, তাই মিশতেও ভাল লাগে ! মুস্তাফা রাজীহল আব্দুলের সঙ্গে আমিনাকে দেখতে এরশাদের বাড়ি যেতে ! তারপর দুইজনে খুব গোপনে নানা পরামর্শ হয় ! কথাবার্তা সেরে, একজন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে, বেশ রাত করে বাড়ি ফেরে আবদুল, মনে একটা আনন্দের অনুভুতি নিয়ে ! দুদিন পরে আবদুল, মুস্তাফা আর একজন ডাক্তার এরশাদের বাড়ি যায়, সঙ্গে গরুর গাড়ি ! এরশাদের খুব-ই রাগ হয়, কিন্তু দুজন আত্মীয় এবং তাদের সঙ্গে একজন বাইরের লোক, ডাক্তার, সেইজন্য সে বিরক্তি গিলে ফেলে গম্ভীর মুখে বসে থাকে, কিছু বলে না ! ডাক্তার অনেক সময় নিয়ে দ্যাখে, নানা প্রশ্ন করে, তারপর ঘোষণা করে মেয়ের অবস্থা খুব খারাপ, প্রথম কাজ হল তাকে বাপের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া, এখন অনেক বিশ্রাম দরকার ! সেখানে গিয়ে মেয়েকে আলাদা করে রাখাই ভাল, অসুখটা ছোঁয়াচেও হতে পারে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ! এই কথাটা শোনারপর ঘর আস্তে আস্তে খালি হয়ে যায় ! একরকম জোর করেই মেয়েকে বাড়ি নিয়ে আসে আবদুল, বাড়ির একটেরে, আলাদা একটা ঘরে ব্যবস্থা হয় তার থাকার ! সেই ঘরে একমাত্র তার মা- বাবার ঢুকবার অনুমতি মেলে, অবশ্য অন্যরা যে খুব আগ্রহী ঘরে ঢুকতে, তা মোটেও নয় ! বৌদিরা তো নয়-ই, এমনিতেই তারা ননদকে হিংসা করে, তারউপর অসুস্থ, কে জানে কি হয়েছে, দূরে থাকাই ভাল ! ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করে, বিপদ থেকে দূরে থাকাই ভাল !

শুরু হয় আমিনার চিকিতসা, এলাহী তার আড়ম্বর, জড়িবুটি, শিকড়-বাকড় – বাটাবাটি, কোটাকুটি, সে এক যন্নী বাড়ির ব্যাপার ! চিকিতসা চলতে থাকে, আমিনা তার মধ্যেই পড়া চালিয়ে যায় ! তারপর পরীক্ষার দিন এসে পড়ে ! তার ঠিক আগেই ডাক্তার বেশ কয়েকটা টেস্ট করতে দিল, কাজেই রোজ আমিনাকে নিয়ে আবদুল যায় ডাক্তারের কাছে, কয়েক ঘন্টা পরে ফিরে আসে ! বেশ কদিন কেটে যায় এভাবেই বিনা কোন ঘটনায় !

আসলে কিন্তু রোজ আমিনা পরীক্ষা দিতে যায় বোরখা পরে, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে ! কৌতূহলীদের জন্য উত্তর তৈরী, কোন নামী পরিবারের বেগম নাকি পরীক্ষা দিচ্ছে, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার পারমিশন নেওয়া হয়েছে ! পরীক্ষা প্রায় শেষ, আর একদিন বাকি কোন ঝামেলা হয় নি, নিরুপদ্রবেই কেটে গেছে এই ক'টা দিন, কিন্তু শেষ রক্ষা হল না ! কদিন ধরেই কৌতূহল চরমে উঠেছে, কে এই বোরখা পরা মহিলা যে পরীক্ষা দিচ্ছে ! শেষ দিন, তখনো পরীক্ষা চলছে হঠাৎ একটা মেয়ে ওইঘরে ঢুকে পড়ে, আমিনা আর দিদিমণি সামলাবার সময় পায়না, আমিনা বোরখায় মুখটা ঢাকার আগেই মেয়েটা দেখে নেয়, বলে ওঠে 'আমিনা'? দিদিমণি তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়, কিন্তু ততক্ষণে যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গেছে, সারা স্কুলে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে খবরটা, আমিনা পরীক্ষা দিচ্ছে ! এক-দুই-পাঁচ কান হতে হতে, আসল জায়গায় পৌঁছে যায় খবরটা ! ফজলুর বন্ধুদের সঙ্গে একটা গাছতলায় বসে গুলতানি করছিল, আড্ডা দিচ্ছিল, খবরটা কানে যেতেই তড়াক করে উঠে দাঁড়ায় 'কে পরীক্ষা দিচ্ছে ?' – জানতে চায়, যে ছেলেটা খবর এনেছিল, ফজলুরের ভাব দেখে, ভয়েভয়ে আবার বলে – 'ওই ওরা বলল আমিনা নাকি পরীক্ষা দিচ্ছে' – 'কি ? কিন্তু সেতো খুব অসুস্থ – 'ওসব আমি জানিনা, আমিনাকে চেনেনা, এমন কেউ আছে নাকি গ্রামে? তাহলে নিশ্চয় খবরটা ঠিক-ই হবে' – রাগ করে ঝাঁঝিয়ে ওঠে বন্ধু ! ফজলুরের সেসব শোনার সময় কোথায় ? রাগে ফুলছে সে, এত আস্পর্ধা, তার, তাদের বাড়ির সকলের আপত্তি সত্বেও পরীক্ষা দেওয়া ? এতো সরাসরি তাদের অপমান করা ! লেখাপড়ার জন্য এটুকু অপমান যে কিছুই নয়, কে তাকে বলে দেয় ? তারা বাড়িশুদ্ধ লোক যে বিনা দোষে, কেবলমাত্র লেখাপড়া করতে চাওয়ার অপরাধে নিরীহ মেয়েটাকে মারধোর, কত অত্যাচার করেছে সেটা তার মনেই পড়ে না ! এমন-ই হয়, সমাজ এভাবেই পুরুষ আর নারীর মধ্যে সুক্ষ্ম তফাৎ গড়ে দেয়, দিয়েছে, আর সাধারণ জনগন মেনে চলেছে, কোনো অস্বাভাবিকতা তাদের নজরে আসে না ! যদি কারোর মনে জিজ্ঞাসার অঙ্কুর জাগতেও চায়, তাকে সমূলে বিনাশ করার জন্য অস্ত্র আছে, ধর্ম, রাজনীতি আরো কত ! মেয়েরা কি তাহলে মানসিক চিন্তাধারায় পুরুষের থেকে বেশি বলিয়ান ? তাই তাদের বেঁধে রাখাটা দরকার, জোর করে তাদের মাথা নামানো দরকার ! লেখাপড়া শিখলে যদি মাথাতুলতে চায়, প্রশ্ন করার স্পর্ধা দেখায় ? সেটা হতে দেওয়া যায় না ! যুগ যুগ ধরে, মানুষ মানুষের সমাজ এভাবেই ভেবেছে ! তাই আমিনার পরীক্ষা দেওয়ার খবরে দপ করে জ্বলে ওঠে ফজলুরের পুরুষসত্ত্বা, যে সমাজের, ধর্মের, সমাজের প্রশ্রয়ে লালিত-পালিত ! সে তখন-ই ছোটে আমিনার স্কুলে ! কিন্তু ততক্ষণে পরীক্ষা শেষ, ছাত্রীরা বাড়ি চলে গেছে, কিছু দিদিমণি-মাষ্টার মশাইরা নানারকম কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত, স্কুলের গেটও বন্ধ ! ফজলুর এসে দমকা ঝড়ের মত আছড়ে পড়ে স্কুল গেট-এ ! ঝাঁকায় বন্ধ গেটের লোহার রেলিং, গেট খোলে না ! দারোয়ানকে নির্দেশ দেওয়া ছিল, সে ফজলুরকে চলে যেতে বলে, নৈলে পুলিশ ডাকবে ভয় দেখায়, ভয় কিছুটা পায় ফজলুর ! অন্যায়কারীরা এখনও কেউ কেউ আইনকে ভয় পায়, সেটাই বাঁচোয়া ! তবুও বলে হেডস্যারকে দেখে নেবে, বাইরে তো বেরোবে কখনো ! দারোয়ান সাবধান করে, সে চেষ্টাও যেন না করে ফজলুর বোকার মত, এইসব ভয় আছে বলেই আগে থেকে FIR করে রেখেছেন হেড স্যার ! তাঁর আর ইস্কুলের কেউ ক্ষতি করলে আর রেহাই নাই ! খাঁচায় আটকে পড়া বাঘের মত নিষ্ফল রাগে গজরাতে গজরাতে ফিরে যায় ফজলুর ! শ্বশুরবাড়ি গিয়ে আমিনা আর তার বাবার সঙ্গে কথা বলার প্রবৃত্তি হয়না তার ! অপমানটা বড্ড লেগেছে, ভুলতে পারছে না ! মনে মনে ঠিক করে ফেলে আমিনাকে তালাক দেবেই সে, এমন জেদী, বেহায়া মেয়ে নিয়ে ঘর করা তার পোষাবে না ! কিন্তু তার আগে একবার বাড়িতে এনে, আচ্ছা করে হাতের সুখ করে আমিনাকে বোঝাবে কে কার মালিক ! হ্যা, এভাবেই ভাবতে শিখেছে এরা, বিয়ে করে আনা বউ তাদের সম্পত্তি, আর পুরুষ তার মালিক ! ফজলুর তো গ্রামের ছেলেমানুষ ছেলে, যা দ্যাখে, শোনে তাই শেখে ! কিন্তু আমাদের প্রাচীন কাহিনিও কি তাই শেখায় না ? নইলে দ্রৌপদীকে পাশা খেলার দাম হিসাবে রেখে যুধিষ্ঠির যখন নিজের অন্যায্য

নেশার বাড়তি সময় অর্জন করে, সমাজ তো ছিছি করে ওঠে না ! দুর্যোধনের সভার জ্ঞানী-পন্ডিত, রথী-মহারথী কেউ তো প্রতিবাদে সভা ছেড়ে চলে যায় না, বরং অধীর আগ্রহে খেলার ফলাফলে মনযোগ দেয় ! কারণ যদি যুধিষ্ঠির হারে, তাহলে দূর্যোধন দ্রৌপদীর সঙ্গে কি ভাবে ব্যবহার করে, সেটা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে ! কারণ দ্রৌপদী নারী, রাজকন্যা হলেও স্বামী তার প্রভু, তার অধিকার আছে স্ত্রীকে বাজী রাখার, আর বিরোধী পুরুষটি জিতলে, তারও অধিকার আছে নারীটির সঙ্গে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করার ! তখন যখন কারো অস্বাভাবিক লাগে নি, এখন ফজলুরের চিন্তায় স্ত্রীকে সম্পত্তিভাবাই তো স্বাভাবিক !

এদিকে খবরটা এরশাদের কানেও পৌঁছেছে ! এরশাদ গরমের সন্ধ্যায় শরবত আর নাশতা সহযোগে বন্ধু সমাগমে বসে গ্রামের ভাল-মন্দ, লোকের হিত-অহিত ইত্যাদি গুরুতর বাক্যালাপে মগ্ন ছিল, পিছনে দাঁড়িয়ে বাতাস করছে জসিমুদ্দিন ! সবে একটা মৃদুমন্দ হাওয়া ছেড়েছে প্রকৃতি, শরীর ক্রমেই স্নিগ্ধ হয়ে আসছে, খানিক আগে গা-ধুয়ে, ফিনফিনে পাঞ্জাবীশোভিত হয়ে, চোখে সুরমা, গায়ে ফুলেলবাস আতর মেখে তুলোয় করে একটু আতর কানের পিছনে গুঁজে শান্ত হয়ে বসেছে এরশাদ ! এইসবই নাকি তাদের সমাজে বড়লোকের লক্ষণ ! বন্ধুবান্ধব সমাগমে এইসব ব্যবহার করতে ভালবাসে এরশাদ, বড়লোকি দেখানো হয়, কি আতর, কোথা থেকে, কত টাকা দিয়ে কেনা, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দিতে ভালবাসে এরশাদ ! কলকাতার নিউমার্কেট থেকে কেনা শুনলে লোকগুলোর চোখ-মুখের চেহারা দেখে খুব মজা পায় সে, মাঝে মাঝে জসিমুদ্দিনকে বলে ওদের গায়েও কিছুটা ছিটিয়ে দেয় – লোকগুলো যেন ধন্য হয়ে গলে যায় ! এইসব মজা আছে বলেই তো বড়লোক হয়ে আনন্দ !

সেদিনও একই রকম একটা বিলাসিতার দিন, গল্প-গুজব বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় এরশাদের গাড়োয়ান সাদেক আলী ছুটতে ছুটতে এসে দুঃসংবাদটা দেয় ! প্রথমে তো বিশ্বাস-ই হয় না এরশাদের, ধমকে ওঠে-'কি বলছিস কি সাদেক ? সে মেয়ের তো খুব অসুখ, বিসনা থেইক্যে উঠতেই পারে না শুনতে পাই, ভাবছিলাম যে গিন্নিকে নিয়ে গিয়ে একদিন দেইখ্যে আসি, সে আবার পরীক্ষা দেবে ?' বন্ধুদের দিকে ফিরে রসিকতার হাসি হাসে, অমনি সমবেত স্তাবকরাও হেসে ওঠে, সেটাই নিয়ম, বড়লোক হাসিরভাব করলে, হাসি না পেলেও হাসতে হয় ! সেতো হল, কিন্তু পরীক্ষা? সাদেক জোর দিয়ে বলে – 'মিছে কতা লয় বাবু, আমি গাড়ি লিয়ে আইসছিলম, গাঁয়ে ঢুকার পর থিকে সব জায়গায় শুনি এই কতা ! সব জাইগাতে মানুষ দায়ঁড়ে কতা কৈছে, আমি শুনি তাজ্জব হইগেলাম, অত অসুখ নিয়ে ভাবি পরীক্ষা দিল কি কইরে বুইঝে পালাম না ! তয় আপনেরে কইতে আইলাম' – এইবার বিশ্বাস হয় এরশাদের, সাদেক তার বহুকালের বিশ্বস্ত লোক, মিথ্যা তো বলবে না ! লজ্জায়, রাগে তার মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে, তাদের মানা সত্বেও পরীক্ষা দেওয়া ? এখন গোটা গ্রাম বিদ্রুপে হাসছে, এরশাদ মিঁয়ার ছেলের বউ তার শাসন মানেনা ! লোকেও কি আর মানবে এরপরে ? রাগে কাঁপতে থাকে এরশাদ, মেয়ে নয় তার বাপের উপর যত রাগ গিয়ে পড়ে, ওই বুড়ার লাই পেয়েই তো এত সাহস মেয়ের ! ঐতো দুই পয়সার চাষী, তার দেমাক কত ! এত বড়লোক মেয়ের শ্বশুর তা কোন মান্যি-গন্যি নাই, আর মেয়ে একটু পড়ায় ভাল বলে গর্বে ফাটছে ! অনেক সহ্য করেছে এরশাদ, আর এবার তো চরম হল ! বার বার মানা করা সত্বেও সেই পরীক্ষা দিল মেয়ে ! বাপটার জোরেই তো ? দেখাবে এরশাদ, ওই বাপটাকে শাস্তি দিতে হবে ! বড় বাড় বেড়েছে ! কি করে জব্দ করা যায় ওই লোকটাকে, ভাবতে হবে ! তাড়াতাড়ি লোকজন কে বিদায় করে দেয়, ঘনিষ্ঠ দু-একজনকে বসতে বলে, জসিমুদ্দিনকে পাঠায় ফজলুরকে খুঁজে আনতে ! তারপর গুজ গুজ করে পরামর্শ করতে থাকে, কি করা এবং কি করে করা ! বাবা ডেকেছে শুনেই ফজলুর ভয় পায়, বউ-এর এই পরীক্ষা দেওয়া নিয়ে এবার বাপ তাকেই ঝাড়বে ! শুধু বকুনি হলে তাও একরকম, বাপটা তো আবার গালাগাল দিতেও ছাড়ে না ! এখন বড় হয়েছে, গালাগাল দিলে খুব অপমান লাগে ! এইসময় তো আবার খামার বাড়িতে বাবার মজলিস বসে, কটা আজেবাজে লোক, যেগুলো আবার বাপের ভক্ত, তারা আসর জমায় ! বাপটার তো রাগলে জ্ঞান থাকে না, বাইরের লোকের সামনেই যা-তা বলে দেবে, হয়ত বউ পরীক্ষা দিয়েছে বলে তাকেই নপুংশক প্রমাণ দিয়ে দেবে ! কি যে করে এখন ফজলুর ? যাবে না সেটা তো হতেই পারে না ! বউ-এর উপর রাগে তার সারা শরীর

রিরি করে, বৌকে একবার বাগে পাক, দেখাবে কত ধানে, কত চাল ! লেখাপড়ার শখ জন্মের মত ঘুচিয়ে দেবে ! সংকল্প ঠিক করে, খামারবাড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়ায় সে ! খামার বাড়িতে গিয়ে দেখে সব শুনশান, বাবার বন্ধুরা প্রায় কেউ নাই, খালি মৌলবী চাচা আর এহসান চাচা চুপ করে বসে আছে ! বাবা পায়চারী করছে, আর মাঝে মাঝে তাদের সামনে এসে খুব নীচু গলায় কথা বলছে, কোন একটা পরামর্শ হচ্ছে বোঝে ফজলুর, ভয়ে ভয়ে গিয়ে একটু দূরে দাঁড়ায় ! জসিমুদ্দিন নিজের কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু কান রাখে এদের কথা-বার্তায় ! তার তো আজকাল এরশাদের উপর খুব রাগ, দেখলেই মনে আগুন ধরে যায়! সে শুধু সুযোগের অপেক্ষায় আছে ! ফজলুরকে দেখে নিজের চেয়ারে এসে বসে এরশাদ – 'খবরটা জেনেছ নিশ্চয়' – যা ভেবেছে তাই, ভাবে ফজলুর, এবার শুরু হবে বকুনি আর গালিগালাজ ! কিন্তু তাকে আশ্চর্য করে দিয়ে খুব ঠান্ডা গলায়এরশাদ বলে – 'আমিনা তো আমাদের মুখে কালি দিয়েছে, গাঁয়ে আর মানসম্মান থাকলনা আমার, মুখ দেখাতে পারবনা' – কি আর বলবে ফজলুর কথাটা তো মিথ্যা নয়, সত্যি এরপরে গ্রামে মুখ দেখানো মুশকিল ! যে এরশাদকে আশপাশের তিন/চারটে গ্রামের লোকে ভয় পায়, তার এমন অপমান ! সামান্য এক চাষী আর তার মেয়ে শ্বশুর বাড়ির মানা সত্বেও চালাকি করে পরীক্ষাটা দিয়ে দাপুটে শ্বশুরের নাকে একেবারে ঝামা ঘষে দিয়েছে ! মনের অবচেতনে একটু বুঝি খুশি-ও হয় ফজলুর, বেশ হয়েছে, দাপুটে জোতদারের থোতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছে এক মধ্যবিত্ত চাষীর মেয়ে ! অবশ্য এসব ভাবনা তার মনেই, মুখে বের করবার সাহস-ই নাই ! বাপ ছেলেরমনোভাব আঁচ করতে জিগ্গেস করে – 'ওরা যে এমন করল, তোমার রাগ হয় নি ?' – রাগে আহত সাপের মত হিস হিস করে ওঠে ফজলুর – 'হয় নাই ? প্রচন্ড রাগ হইয়েছে' – বাপ কথা লুফে নেয় – 'তো কৈর বেটা কি ? প্রতিশোধ নিবানা ?' – ছটফট করে ওঠে ছেলে – 'হ্যা হ্যা, নিব' – বাপ বন্ধুদের দিকে একবার চেয়ে দ্যাখে, তারপর 'কি কইরবে ভাব ?' – মাথা নাড়ে ছেলে – 'ভাইবতে পারিনা কি করি, উরা সারাজীবন মনে রাইখবে' – বাপ খুশি হয় – 'হুম, এটাই তো চাই ! দোষীরে কখনো ছাইরবানা, শাস্তি দিতে হব্যে, নাইলে রাশ আলগা হইয়ে যাব্যে, আমার পরে তুমাকেই তো আমার এত্ত বিষয়-সম্পত্তি, জমিজমা সব সামলাইতে হব্যে' – ছেলের মনে লোভ জাগিয়ে তুলতে চায় এরশাদ, এবং সফলও হয় ! ফজলুর ভাবে তখন আর বাপের উপর নির্ভর করতে হবে না প্রতিটা পয়সার জন্য ! ভাব দেখে খুশি হয় এরশাদ, কাছে ডাকে – 'আমি কৈয়েদি কি করবা' – খুশি হয়ে বাপের কাছে যায় ফজলুর, তারপর তিন পাকামাথা আর এক তরুণের মাথা কাছাকাছি, পাশাপাশি – সলাপরামর্শ, গভীর ষড়যন্ত্র হয় অনেক্ষণ, কাক – এইচারজন ছাড়া, কাকপক্ষী টের পায় না ! কিন্তু আরেকজন শুনল সব, এরশাদের আপ্ত সহায়ক, তার পালিত পুত্র-চাকর জসিমুদ্দিন!

সে রাত কাটল যেমন-তেমন ! আব্দুলের ছেলেরা-বৌরা-নিজের বিবি সকলেই বিরক্ত, রাগ করে বকাবকি ঝগড়া বাড়িতে ! ভাইরা আমিনাকে এই মারে তো সেই মারে ! নেহাৎ বিবাহিত বোন, অন্যের ঘরের সম্পত্তি তাই গায়ে হাত তোলে না ! এখানেও বোন সেই সম্পত্তি, ভাবছে কে, মেয়েটার ভাই ! সমাজের ভুল শিক্ষা এমন মজ্জায় মিশে গেছে যে, নিজেদের অজান্তেই এসব ভাবনা মনে আসে মানুষের ! ব্যক্তি মানুষের দোষ মনে হয় ততটা নয়, যতটা মানবগোষ্ঠির ! আমিনার ভাইরাও সেভাবেই ভাবে, বকাবকি যথেষ্ট করলেও গায়ে হাত তোলে না অপরের সম্পত্তি বলে ! বকাবকির মাঝেই তারা বলে, পড়া পড়া করে আমিনার এই পাগলামির মানে কি তারা তো বোঝে না ! শান্ত আমিনা জবাব দেয় 'তোমরা বুঝবেনা, তোমরা মেয়ে নও যে ! একজন ছেলে পড়তে চাইলেতো পরিবারে বা সমাজে কোন কথা ওঠেনা, কোনো বাধা আসে না ! বরং নানাভাবে চেষ্টা করা হয় তাকে পড়ানোর, অর্থের এবং অন্যান্য অসুবিধা সত্বেও ব্যবস্থা করা হয় তাদের পড়ার, পরীক্ষার সময় বাড়তি দুধ-ডিম-খাবার সেই ছেলেটির জন্য বরাদ্দ হয় ! মেয়েকে তের/চৌদ্দ বছর বয়সেই বিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হওয়ার চেষ্টা হয়, তাসত্বেও কোন মেয়ে যদি বড় কোন পরীক্ষা অব্দি পৌঁছে যায় নিজের চেষ্টায়, উদ্যোগে, কটা পরিবার তার জন্য কোন ব্যবস্থা করে ? সে পরীক্ষা দেয়, পাশ করলে ভাল, না পাশ করলেও কি আর এসে যায় ?' বলছে কে ? আমিনা, সাধারণ চাষীর ঘরের ছোট্ট একটা মেয়ে, যে পড়তে ভালবাসে, তার জন্য যত বাধা এসেছে, ততই সে বিভেদটা বুঝতে শিখেছে ! তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তাকে এভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে ! তার স্বামী ফজলুর লেখাপড়ায় মোটামুটি, আমিনার ধরে কাছেও নয়, লেখাপড়ার প্রতিতার বিশেষ কোন ভালবাসাও নাই, তবু পরিবার থেকে চেষ্টা

করেছে, বুঝিয়ে, ধমকিয়ে, বাবুবাছা করে ! অথচ আমিনা যে লেখাপড়ায় শতগুনে ভাল, শিক্ষকদের মতে এই গ্রাম কেন আশেপাশের গোটাকয়েক গ্রামেও খুঁজলে এমন ছাত্রী পাওয়া যাবে না ! তার পড়ায় কত বাধা ! যাইহোক, এসব অনেক বড় আলোচনা, এত সহজে কাউকে বোঝানো সম্ভব নয়, বিভেদটা এত সুক্ষ্ম আর এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত যে সাধারণের চোখেই পড়ে না, তাই কেউ বললেও বোঝে না ! আমিনার ভাইরাও বুঝল না, তারা বেশ খানিকক্ষণ বাপ ও বোনকে বকাবকি করে নিজেদের ঘরে যাওয়ার আগে বলে যায় যে, এই কাজের ফলে পরিবারের যদি কোনো বিপদ-আপদ হয়, তারা এদের কোনদিন ক্ষমা করবে না, আর এদের দুজনের ব্যক্তিগত কোন বিপদাপদ হলে তারা কোন দায়ও নেবে না ! দুইভাই গজ গজ করতেকরতে বেরিয়ে যায়, পিছনে তাদের বৌরা, যারা নিজেরাও বিদ্যেবতী ননদের বিদ্যার বহর দেখে খুব-ই ঈর্ষান্বিত এবং তার এই পড়ার বাতিকে বিরক্ত!

পরদিন সকাল থমথমে, সারাটা গ্রামে কেবল একটাই আলোচনা আবদুল আর তার মেয়ের বুকেরপাটা আর সাহসের তারিফ মুখে মুখে ! ওরকম বদমাশ জোতদার বেশ জব্দ হয়েছে দেখে, প্রায় সকলেই খুশি ! বোঝে সকলেই, কিন্তু ভয় পায় কিছু বলতে, বউ-বাচ্চা নিয়ে ঘর করা, বিপদকে এড়িয়ে থাকতেই ভালবাসে নির্বিরোধী জনগন ! কিন্তু তাতেই যে দুর্জনের শক্তি বাড়ে, সেটা বোঝে না ! তার মধ্যেই হঠাৎ আমিনার মত কেউ ছোট কোন বিষয়ে বিদ্রোহ করে, তার সমর্থনে জুটে যায় আব্দুলের মত নিরক্ষর, কিন্তু সাহসী, সৎ কোন মানুষ ! গ্রামের মানুষ ভাবতে শুরু করেছে, তাহলে তো এরশাদের মত মানুষের বিরুদ্ধেও যাওয়া যায় ! এই ভয়টাই পাচ্ছে এরশাদ ! তাই প্রতিশোধের জন্য আমিনা-আব্দুলকে কঠিন শাস্তি দেওয়ার কথা ভাবছে ! ভয় পাইয়ে রাখতে হবে, সেটাই রাজত্ব করার সহজ রাস্তা ! আবদুল সেদিন আর বাড়ি থেকে বেরয় না, দুশ্চিন্তা হচ্ছে তারও, কি জানি কি হয় ! এরশাদ তো চুপ করে থাকার লোক নয়, মেয়ের পড়ার জেদ, আর তার মেয়েকে সমর্থন, যত নিরীহ-ই মনে হোক, সেটাকে বিদ্রোহ হিসাবেই দেখবে এরশাদ, আর বদলাও নেবে ! এবার তো ছেলেকেও সঙ্গে পাবে ! সেদিন আবার এসেছে ঘোর অমাবস্যা, তার মধ্যে লোডশেডিং, বিজলীবাতি জ্বলে নি ! যদিও টিমটিমে বাতিগুলো এমন কিছু আলো দেয় না, তবু অভ্যাসের একটা সহজতা আছে, তাই বিজলীবাতি না-জ্বললে আজকাল গ্রামের মানুষের-ও অসুবিধা হয় ! তার উপর কেরোসিনের আকাল, মেলে কি মেলেনা ঠিক নেই ! যার ঘরে বিজলী বাতি নেই, সেও একটা লন্ঠন একটা কুপি দিয়েই কাজ চালিয়ে দেয়, রাস্তার পাশে ঘর হলে, রাস্তার বাতির আলোয় দিব্যি কাজ চলে ! লেখাপড়ার কাজ তো কিছু নয়, এমনি সময় কাটানো ! কাজেই বিজলীহীন অন্ধকার অমাবস্যায় কুপি-লন্ঠনের আলোয় তাড়াতাড়ি রান্না-খাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়তে চেষ্টা করে লোকে ! এদিন-ও তেমনি, কিন্তু অত অন্ধকারেও একজন হন হন হেঁটে যায়, গামছায় মুখ-মাথা ঢাকা, পৌঁছয় আব্দুলের বাড়ি ! তাকে দেখে আবদুল অবাক হয়, ভয় পায় ! ছেলেরা যে যার ঘরে বউ-বাচ্চানিয়ে ব্যস্ত, তারা যেন টের না পায়, সাবধানে রাতের বার্তাবাহককে ডেকে নেয় নিজের ঘরে ! যা শোনে, তাতে ভয়ে, দুশ্চিন্তায় তার মুখ শুকিয়ে যায়, আগন্তুক আর কেউ নয়, জসিমুদ্দিন ! সে এসেছে বিপদের খবর আগাম পৌঁছে দিতে, যাতে এরা একটা প্রতিরোধের চেষ্টা করতে পারে ! যদি এরা নিজেদের রক্ষা করতে পারে, যদি এরশাদের প্ল্যানটা কাজ না করে, তাহলে তার শান্তি !

আর কেউ নয় জসিমুদ্দিন, আজ তার বদলা নেওয়ার সুযোগ এসেছে, যদি এরশাদের রাগের কোপ থেকে আমিনা-আবদুল বেঁচে যায়, সে মনে করবে তার মা-বাবার উপরে হওয়া অন্যায়ের কিছুটা বদলা সে নিতে পারল ! এরশাদের পরিকল্পনা শুনে আবদুল ভয় পেয়ে যায় ! এত বড় বিপদের কথা, আবদুল ছেলেদের জানাতে চায়, জসিমুদ্দিন বাধা দেয়, সে চলে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পরে যেন আবদুল ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে, নইলে তার নাম জানা গেলে সে আর প্রাণে বাঁচবে না ! তার ভয়ের যৌক্তিকতা আছে, এরশাদ যে ধরণের লোক, তার পক্ষে সব-ই করা সম্ভব ! এর আগে দু-একটা খুনের ঘটনায় তার নাম উঠেছে, প্রতিবার-ই প্রমাণাভাবে, অথবা টাকার জোরে বেকসুর খালাস পেয়েছে ! গুরুত্ব বুঝে জসিমুদ্দিন চলে যাওয়ার আধঘন্টাখানেক পরে ছেলেদের ডাকে, এবং বিপদের কথাটা জানায় ! ছোট ছেলেটা একটু আকাট, গোঁয়ার মত, প্রথমেই ঝাঁঝিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, বড় ভাই থামায় তাকে, তারা জেনে গেছে সেটা এরশাদের কানে গেলে, আর উপায়নাই ! খবরটা হল, এরশাদের ছেলে ফজলুর লোকজন নিয়ে আসছে আব্দুলের ক্ষেতে আগুন দিতে, হেমন্তের ঠান্ডা

রাত, ক্ষেতে পাকাফসল উপচে পড়ছে, কেটে নেওয়ার অপেক্ষা শুধু ! ধান উঠে গেছে আগেই, এখন রবিশস্যের সময়, লোকে বলে আব্দুলের হাতে জাদু আছে, ছেলেদুটোও খাটতে পারে খুব মাঠে যেন সোনা ফলে তাদের ! এই অমবশ্যা রাতে ঘন কুয়াশায় ভিজে মুগ-মুসুর-ছোলা গাছগুলো শান্ত শুয়ে আছে, এসময় হিম খেলে নাকি ফসল বেশী মিষ্টি হয়, তাই কাটার ক-দিন দেরী ! আজ-কালের মধ্যেই কেটে গোলায় তোলা হবে, এ সময় এই বিপত্তি ! এবং ক্ষেতের পরে, বাড়ি এসে গোলাতেও আগুন দেবে তারা, আব্দুলকে মারধর করারও পরিকল্পনা আছে তাদের, সবটাই জেনেছে আবদুল ! দলবল নিয়ে আসবে, তাদের সামলাবে কে ? ছেলেরাও ভয় পেয়ে যায়, বাপকে বলে যেমন করে হোক সে আর আমিনা এই রাতেই কোথাও চলে যাক, ছোটভাইকে নিয়ে সে যাচ্ছে মাঠ পাহারায়, এরশাদ তার বউ-এর দূর সম্পর্কের আত্মীয় হয়, ভালভাবে অনুনয় করলে হয় তো মানবে, তাছাড়া আবদুল নেই জানলে, তাদের রাগটাও কমবে ! বৌদের এখন কিছু বলার দরকার নেই, অকারণ ভয় পেয়ে একটা তাল লাগিয়ে দেবে ! চাষীর ঘরের বউ, রাত পাহারা ব্যাপারটা জানা আছে তাদের ! তার মা বলে সেও যাবে বাপ-মেয়ের সঙ্গে ! ছেলেরা সানন্দে রাজী হয়, তাদের সন্তানরা বড় হয়ে গেছে, এখন আর মাকে তাদের সবসময় তাদের দরকার হয় না, বরং বুড়ি থাকলেই বৌদের সঙ্গে খিটিমিটি, দুপক্ষকে সামলাতে তাদের জান যায় ! মনে মনে একটু খুশিও হল কি যে মা-বাবা ছাড়া তারা সংসারকরতে পারবে, অন্তত কিছুদিনের সাময়িক হলেও ! কিন্তু আবদুল প্রশ্ন করে – 'কুথায় যাব ? কার কাছে ? এই গেরাম আর তার মানুষজন ছাড়া আমি তো কাউকে চিনিনি রে, কোনো জায়গাও জানি না' – এই আরেকটা সত্যি, এইসব মানুষ নিজেদের জগতে অতি সন্তুষ্ট থাকে, অন্যকোথাও সুখ খুঁজতে যাওয়ার দরকার-ই হয় না তাদের ! আর টাকা দেখানোর জন্য নিয়ম করে বেড়াতে যাওয়াটা শহরের ফ্যাশন, গ্রামকে এখনো কব্জা করতে পারে নি ! যাই হোক বাবার কথার উত্তরে গোঁয়ার ছোট ছেলে বলে ওঠে – 'সি কতাতো আগে ভাবতি হত, আদরিনী মেয়েইয়ের বাজে একটা জিদের জন্য বিপদে পড়ে, এখন ভাবলি কি হবে ?' – এভাবেই বলে সে, লেখাপড়াটাকে বাজে জেদ আখ্যা দেয়, এমনটাই তো ভাবে সকলে, ছেলেদের ভাবতে শেখায় ! মেয়েদের পড়তে চাওয়াটা বাজে জেদ ! বড় ছেলে ভাইকে থামায় তারপর বলে – 'কেন রফিক চাচা তো কলকেতায় থাকে, কতবার বলেছে যেতি ! এই সেদিনও তো ...' – 'তা যাওয়া যায় বটে, কুথাওতো বেরাতিও যাইনি কুনদিন, কিন্তু কদিন, কি বেত্তান্ত' – বাপকে থামায় বড়ছেলে – 'সেসব কতা পরে ভাবলিও চলবে, এখন তো বাঁচ পরানে' – শেষ অব্দি সেটাই সাব্যস্ত হয়, ভাবার সময়-ও বেশি নাই, মাঝরাতেই নাকি আসবে এরশাদের ছেলে দলবল নিয়ে, তার আগে যতটা সম্ভব গ্রাম থেকে দূরে চলে যাওয়া দরকার ! তাড়াহুড়ায় যা পারে কখানা কাপড়জামা গুছিয়ে নেয় তারা, একেবারে গাড়ি জুতে, গাড়োয়ানকে ঘুম থেকে তোলে, সে কিছু বোঝা-বলার আগেই তারা রওনা দেয়, বেশী রাতের শেষ গাড়িটা না ধরতে পারলে, আজ আর যাওয়া হবে না ! সেই শেষ, একরাতের মধ্যে ঘরবাড়ি-পরিচিত গ্রাম-পরিজন সব ফেলেরেখে অপরিচিত কলকাতার পথে বেরিয়ে পড়ে আবদুল আর তার বউ-মেয়ে ! ভোর ভোর কলকাতায় নামে তারা, বড় ছেলের লিখে দেওয়া ঠিকানা দেখিয়ে ট্যাক্সিকে গন্তব্যের নির্দেশ দেয়, সাত সকালেই আব্দুলেদর দেখে রফিকের পরিবার অবাক এবং খুশি হয় খুব, কতবার বলেছে আসতে, আব্দুলের সময়-ই হয় না ! তবু এল শেষ পর্যন্ত ! রফিক সম্পর্কে আব্দুলের ভাই, কিন্তু তার তুলনায় বন্ধু অনেকবেশী, দুজনের মেলে খুব, দুজন-ই নির্ঝন্ঝাট, ভাল মনের মানুষ, তেমনি দুটি পরিবারেও খুব মিল ! কার সাথে কার যে মন মিলে যায়, বলা কঠিন ! রফিকের পরিবার শহরে থাকে, অনেক মার্জিত স্বভাবের, আর আবদুল তো একেবারেই সাচ্চা মানুষ ! আবদুল বলতে শুরু করে তাদের আসার বাধ্যতার কথা, তাকে থামায় রফিক – 'ওসব পরে শুনব অষন, এসেছ কিছুদিন তো থাকবে, নাকি কাল-ই পালাবে ? আর আমি তো জানিও অনেকটা ব্যাপার, গ্রামে গেলে লোকমুখে শুনি তো !' অতএব রফিকের বাড়ি হল শহরে তাদের প্রথম ঠিকানা !

এভাবেই শুরু হয় আব্দুলের কলকাতা বাস, বারুইপুরে, রফিকের বাসায় বেশ কিছুদিন থাকতে হয় তাদের ! ভালই ছিল তারা সেখানে, রফিকের বউ আর আমিনারমা দুজনে মিলে ঘরের কাজকর্ম করত, আমিনা রফিকের তিন ছেলেমেয়ের সঙ্গে বেশ মিশে গেল, ওদের কতরকম গল্প, দেশ বিদেশের কথা, যত শোনে তত চমতকৃত হয় আবদুল, আর এবার লেখাপড়ার উপকারিতাটা ঠিকমত বুঝতে পারে ! এতদিন তো মেয়ের ভালবাসায়,মেয়েকে সমর্থন করেছে, কিন্তু এখন

আমিনার ভালবাসার কারণটাও বুঝতে পারে ! লেখাপড়ার মর্ম যারা বুঝেছে, তাদের মনটা কেমন অন্যরকম হয়ে যায়, দেখছে আবদুল ! দ্যাখে রফিককেও, গ্রামের বদ্ধ জলার পাঁকাল মাছের মত পড়ে থেকে পাঁকঘাঁটেনি রফিক, লেখাপড়া করেছে, শহরে এসে চাকরী করছে, লেখাপড়া জানা শহরের মেয়ে বিয়ে করেছে, কি সুন্দর হয়েছে তাদের সংসার, ছেলে-মেয়েগুলো কলেজ-ইস্কুলে পড়ে, কত খোলামেলা মন, কুচুটে স্বভাব নয় ! মেয়েদুটোর বিয়ে দেয় নি এখন-ও, বড় মেয়েটা একটা প্রাইভেট ইস্কুলে পড়ায়, ছোট মেয়ে আর ছেলে দুজন কলেজে পড়ে ! আসে-যায়, ঘোরে ফেরে, রফিকদের কোন চিন্তা নাই তাদের নিয়ে ! মেয়েদের বিয়ের কথা জিগ্গেস করলে হাসে রফিক আর তার বউ, এত তাড়া কিসের ? দেব বিয়ে, কদিন একটু স্বাধীন থাকুক, বিয়ে মানেই তো বন্ধন, মেয়ে মানুষের বেশী করে, আর তোমার মেয়ের মত শ্বশুরবাড়ি হলে তো প্রাণে বাঁচাই দায় ! কথাটা ঠিক-ই বলে রফিক, তাড়াহুড়া করে মেয়েটার বিয়ে না দিলে, কত সুন্দর জীবন থাকত তার মেয়ের, যাই হোক ভেবে আর কি হবে, যা হবার হয়েছে, এখন এই শহরে এসে বাকি জীবনটা লেখাপড়া করে, ইচ্ছে মত থাকতে পারে, তবেই হয় ! রফিকের ছেলেমেয়েরা আমিনাকে নানা পরামর্শ দেয় কোথায় ভর্তি হবে, কি পড়বে সেসব ব্যাপারে ! তাদের মত যাদবপুরে পড়াই ভাল, ভাল ইউনিভার্সিটি, আসা-যাওয়া করাও সহজ হবে আমিনার পক্ষে, এক ট্রেনে মাত্র কয়েকটা স্টেশন ! সেটাই ঠিক হয়, এখন রেজাল্ট বেরোনোর অপেক্ষা ! তবে সেসবের আগে আব্দুলের একটা রোজগারের ব্যবস্থা হওয়া দরকার ! সেই কবে এসেছে, সঙ্গে আনা টাকা থেকে, রফিককে এই ক-মাস কিছু কিছু টাকা দিয়েছে বটে, কিন্তু সে আর কত ? বাড়িভাড়া, তিনটে লোকের খাই-খরচ হিসাব করলে, কিছু না ! একটা বাড়িও দেখা দরকার, ভাড়ায় নিতে হবে, কেনবার টাকা কই ? রফিক এর মধ্যে আমিনা আর আব্দুল দুজনের একটা জয়েন্ট একাউন্ট খুলিয়ে দিয়েছে ব্যাঙ্কে ! মেয়েরা ATM মেশিন থেকে টাকা তোলা, ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়া সব শিখিয়ে দিয়েছে, আমিনাও বেশ চটপট শিখে নিয়েছে, লেখাপড়া সেও তো একটু শিখেছে ! আরেকটা গুণ দেখছে আবদুল, লেখাপড়া শিখলেই মানুষ কেমন চালক-চতুর হয়ে ওঠে,তাদের মত গেঁয়ভুত হয়ে থাকতে হয়না ! রফিকের সঙ্গে আলোচনা করে রিক্সা চালানোটাই ঠিক মনে হয় সকলের, লেখাপড়া জানেনা যে কোথাও খাতা লেখার কাজ পাবে, কাউকে চেনেনা যে দারোয়ানের কাজ পাবে, রিক্সাটা শিখে নিলে চালানো খুব কঠিন নয়, প্রথমে একটু কষ্ট হবে, তবে চাষী মানুষ গায়ে খাটার কষ্ট তো সওয়াই আছে, পারবে আবদুল, জোর দিয়ে নিজেই বলে ! সেই কথামত এক চেনা মালিকের কাছে গিয়ে রিক্সার ব্যবস্থা করে দেয় রফিক, চালানো-ও শেখায় সে-ই, কত যে গুণ এই মানুষটার, ভেবে পায় না তারা ! কদিন শিখে রিক্সা নিয়ে বেরোতে শুরু করে আবদুল, ধীরে রোজগার বাড়ে, রফিকের হাতে কিছু তুলে দিতে পারে, লজ্জা একটু কমল তার ! কিন্তু এবার একটা বাসা দেখতে হয়, না হয় বস্তিতেই থাকবে, একরাতে ঘর ছেড়ে আসতে হয় যাদের, তাদের আবার বাছ-বিচার ! কিন্তু রফিক কথাতে কান দেয় না, এত ব্যস্ত কেন ? আমি ভাবছি, ব্যবস্থা করছি, চুপ করে বসে থাকো দিকি ! কি যে ভাবছে রফিক, সেই জানে ! আজকাল আবার ঘন ঘন গ্রামে যাওয়া শুরু করেছে, এসে খবর দেয় সেখানে নাকি এরশাদের ছেলের দৌরাত্ম্য খুব বেড়েছে, আমিনার ঘটনার পর থেকে, সব মেয়ের উপর তার যেন রাগ, আর ইস্কুলে যেতে দেখলে তো উপায় নেই ! মেয়েগুলো ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে, ফজলুর আর তার দলবল কে দেখলেই অন্য দিক দিয়ে চলে যায় ! ওদিকে আব্দুলের ছেলেরা আছে বহাল তবিয়তে, মা-বাবা-বোনের জন্য তাদের যে কোন চিন্তা আছে, তাতো মনে হয় না, তারা এসে খবর নেয় না, রফিক নিজেই গিয়ে বলে আসে ! বাপের অনুপস্থিতিতে তারাই তো মালিক এখন ! এরশাদের সঙ্গেও কিছু একটা রফা করে নিয়েছে, মনে হয় ! আবদুল আর কোনদিন-ই গ্রামে ফিরে যেতে পারবে না ! তাতে কিছু না, শহরের জীবন দেখার পর, আর ফিরতে চায়ওনা আবদুল ! কিন্তু পাকাপাকি থাকতে হলে তার তো একটা বাসস্থানের ব্যবস্থা চাই, আত্মীয় ভাই-এর বাসায় আর কতদিন থাকবে ? রফিক বলে সেটার চেষ্টাই তো করছি, হয়ে যাবে একটা কিছু, তুমি ভেব না ! তার ব্যাপার, সে ভাববে না, কি যে বলে রফিক ! ওদিকে আমিনার রেজাল্টের সময় আসছে, তখন আবার ভর্তির ব্যবস্থা, তার আগে.... হয়ে যাবে তার আগেই, রফিকের আশ্বাস, তবু দুশ্চিন্তা একটু থেকেই যায় ! কিন্তু সত্যি-ই ব্যবস্থার কথা ভেবেছে রফিক বোঝা গেল পরের সপ্তাহে, আবার গ্রামের বাড়িতে গেল এবং এবার যখন ফিরল, বিশ্বজয়ের হাসি তার মুখে ! কি ব্যাপার ? জামাকাপড় ছেড়ে, হাতমুখ ধুয়ে বন্ধুর সঙ্গে চা-চপ-মুড়ি খেতে খেতে আসল কথাটা ভাঙ্গে রফিক, আব্দুলের ছেলেদের কাছ

থেকে বেশ কিছু টাকা বের করে এনেছে রফিক!দিতে কি চায় তারা, বলে বাবা ফিরবে তো আবার, তখনতো বাবার-ই সব ! তা যদি হয়, তখন শহরের বাড়ি বিক্রি করতে কতক্ষণ ? বলেছে রফিক, তবু তানানানা করে, সেই জন্যই এই কয় সপ্তাহে বার বার গ্রামে যাচ্ছে রফিক, এবার সরাসরি আইনের ভয় দেখিয়েছে ! মামলা করবে আবদুল যে বাপ-মা-বোন সকলকে বঞ্চিত করে, বাড়ি থেকে বেরকরে দিয়ে সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে দুই ছেলে,তখন ঘাড় পাতে, টাকা বেরয় ! চেক বের করে দেখায় হাসতে হাসতে, বাপরে এ যে মেলাটাকা' – হ্যা মেলা, তোমার একটা ছোট বাড়ি কেনার ব্যবস্থা করেছি, ভাড়া নয়, নিজস্ব ! কোনদিন কারো বাড়িতে ভাড়া থাকনি, পারবে নাকি এই বয়সে ? আর বস্তিটস্তি জায়গা ভাল হয় না, মেয়ে নিয়ে থাকা, নানা বিপদের ভয় ! কৃতজ্ঞতায় চোখে জল এসে যায় আব্দুলের, এই না হলে মানুষ ? আবদুল ভাবে আল্লা সবরকম ব্যবস্থাই করে রাখেন, তবে মানুষের রূপের কাউকে দিয়ে করান ! কথা বলতে পারে না, রফিকের হাতটা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে ! বিব্রত হয় রফিক – 'আরে ঠিক আছে, তুমি আমার ভাই-বন্ধু, তোমার মেয়ে, পরিবার তো আমারও আপনজন ! টাকা আসার পর দারুণ ব্যস্ততায় কাটে কদিন, কথা বলাই ছিল রফিকের, বাড়ি দেখে পছন্দ হল সবারই ছোট, কিন্তু জল, বাথরুম সব নিজস্ব, ভাগাভাগি, ঝগড়াঝাঁটির দরকার হবে না ! বাড়ি কিনে, কিছু জিনিস পত্র কিনে, কিছু রফিকের দেওয়া পুরোনো যোগাড় করে গুছিয়ে বসতে গেল কটাদিন ! এবার থেকে পাকাপাকি শহুরে হল তারা ! আবদুল রিক্সা চালায়, ভালই রোজগার হয় আজকাল, তার বউ তিনটে বাড়িতে ঠিকা কাজ নিয়েছে, সমৃদ্ধ চাষী ঘরের বউ এখন শহরের কাজের লোক ! তবে আলস্য নেই, আর গায়ে খাটা অভ্যাস আছে বলে অসুবিধা হয় না ! এভাবেই জীবন বদলে যায় কজন মানুষের, ধীরে শহরের জীবনে মিশে যায় তারা !

কিন্তু আমিনার লেখাপড়া, যার জন্য এই পরিবর্তন ? সেটাই তো আসল গল্প ! আমিনার জন্য একটা বাংলা কাগজ রাখা হয় বাড়িতে, দুপুরে রান্না-খাওয়া মিটলে মা-বাবার বিশ্রামের সময় পত্রিকা পড়ে শোনায় আমিনা ! খবর শোনার চেয়ে মেয়েকেই মুগ্ধ হয়ে দ্যাখে তারা, তাদের মেয়ে গড়গড় করে পড়ে যাচ্ছে, বিস্ময় তাদের কাটে না ! দিন এভাবেই কাটছে, গ্রাম ছেড়ে আসার দুঃখ, অসুবিধা ধীরে ধীরে ভুলে যাচ্ছে তারা, এমন সময় আবার সুখসমাচার ! আমিনার পরীক্ষার ফল ! পত্রিকায় একদিন দ্যাখে আমিনা আগামী কাল তাদের রেজাল্ট জানা যাবে, কোথায়, কি ভাবে খবর পেতে পারে সব লিখেছে পত্রিকায় ! বলতে ভুলেছি এখন তাদের মোবাইল আছে, শহর জীবনে যা অতি প্রয়োজনীয় ! আমিনা রফিকের বাড়ি গিয়ে খবরটা জানায়, দেখা যায় তারাও টিভি, পত্রিকা এসবের দৌলতে জেনেছে খবরটা, এবং সেটা নিয়েই আলোচনা করছে ! রফিকের ছোট মেয়ের কলেজ ছুটি ছিল সেদিন, সে যথাস্থানে ফোন করে জেনে নেয় খবরটা – আমিনা ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে জানা যায়, দুটো লেটার ! ফার্স্ট ডিভিশন, সাধারণ চাষী ঘরের মেয়ে, না টিউশন, না কিছু, তবুও ! রফিকের ছেলেমেয়েরা একটা বিশেষ দৃষ্টিতে আমিনাকে দ্যাখে ! মেয়েটাকে ভাল লাগত তাদের, কিন্তু সে যে একটা বিশেষ মানুষ, আজ প্রথম তারা সেটা বোঝে !

ওদিকে গ্রামে তো হইচই পড়ে গেছে, এই প্রথম এই গ্রামের কোন পরীক্ষার্থী বোর্ডে স্ট্যান্ড করেছে, স্কলারশিপ পেয়েছে ! এতদিনে ফজলুরের একটু আপশোস হচ্ছে নিজের ব্যবহারের জন্য ! এই প্রথম বউ-এর জন্য একটু সম্মান এল তার মনে ! যে পড়া করতে তার দম বেরিয়ে গেছে, বিরক্ত হয়ে মাধ্যমিকের পর প্রায় ছেড়ে দিয়েছে সে, সেই পড়াতেই তার বউ এত ভাল, ভেবে বিস্মিত সে ! স্কুল থেকে একজন শিক্ষক আব্দুলের বাড়ি এসে রফিকের কলকাতার বাড়ির ঠিকানা নিয়ে গেছে, সেখানে খবর দেওয়া হবে স্কুলের পক্ষ থেকে ! একদিন একজন শিক্ষিকা আর শিক্ষক রফিকের বাড়ি এসে রফিকের সঙ্গে আব্দুলের বাড়ি গিয়ে সুখবরটা দিলেন, কবে গিয়ে রেজাল্ট আনবে, স্কলারশিপের ব্যবস্থা কিভাবে সব বুঝিয়ে দিলেন ! তাঁরাও খুব খুশি তাঁদের স্কুলের নাম উজ্বল হল আমিনার কল্যাণে ! নম্র, সভ্য, শান্ত, বুদ্ধিমতি মেয়েটাকে তাঁরা ভাল বাসতেন আগেই, এখন তার সঙ্গে একটা শ্রদ্ধাও যুক্ত হয়েছে!অত অসুবিধার এবং বিরোধিতার মধ্যেও যে মেয়ে এমন রেজাল্ট করে, সে যে ভাল অবস্থায় থাকলে বোর্ডে প্রথম হত সে বিষয়ে তাঁরা একরকম নিশ্চিত এখন ! ওদিকে জেলাতেও একটা সাড়া পড়ে গেছে, জেলাধিকারিক স্কুলে খবর পাঠিয়েছেন আমিনার সম্মানে একটা ভাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে, তাঁরাও সম্বর্ধনা দেবেন, পুলিশ কর্তা, এবং অন্যান্য বড় সরকারী আধিকারিকরা আসবে, দু-একটা স্কলারশিপও ঘোষণা হবে

সেদিন, কলকাতা এবং জেলা থেকে সাংবাদিকরা আসবে, টিভি কোম্পানীগুলোও আসতে চায় ! কাজেই যেন যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হয় ! যথা দিনে আমিনাকে নিয়ে আবদুল, রফিক, এরা গ্রামে আসে, স্টেশনে নামতেই পুলিশ ঘিরে ধরে, যথপোযুক্ত সম্মানের সঙ্গে তাদের স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়, অনুষ্ঠানের আয়োজন খুব-ই সুন্দর এবং মহত্ত্বপূর্ণ, আমিনা খুশি হয়, লজ্জাও পায়, তাকে নিয়ে এত কান্ড বিশ্বাস হয় না যেন ! শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রণাম, আদাব জানালে তাঁরাও আশির্বাদ-ভালবাসা জানান ! ফজলুর অনেক চেষ্টা করে আমিনার কাছে পৌঁছবার, কিন্তু পুলিশ কর্ডন ভেদ করে বউ-এর কাছ অব্দি আসা দুরুহ হয় তার পক্ষে, এভাবেই অমানুষ অশিক্ষিত আর ভাল শিক্ষিত মানুষ গুলোর মধ্যে দুরত্ব বেড়ে যায় ! ফজলুর বুঝতে পারে তার আর আমিনার মধ্যের দুরত্ব বেড়ে গেছে শত যোজন, মেনে নেওয়া ছাড়া গতি নেই আর ! আমিনার ভাইরাও এসেছিল অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে, বোনের জন্য তারাও আজ সম্মানিত, গর্বে মন ভরে যায় তাদের ! আবদুল একটা বিশেষ সম্মানের অসন পায় এই অনুষ্ঠানে ! তাকেও কিছু বলতে অনুরোধ করে সাংবাদিকরা, সে আর কি বলবে ? সে যে নিজে অক্ষরজ্ঞানহীন সেটা জানিয়ে বলে সে কিছুই জানে না, বোঝেনা কিন্তু মেয়ের ইচ্ছা এবং জেদ দেখে তার মনে হয়েছিল মেয়ের ইচ্ছাকে সম্মান-সমর্থন করা তার কর্তব্য, ব্যস এটুকুই ! শত বাধা-বিঘ্ন সত্বেও এক নিরক্ষর চাষী, মেয়ের লেখাপড়ার ইচ্ছাকে সমর্থন করেছে,সম্মান দিয়েছে সেটার উল্লেখ করে সব বক্তাই তাকেও সম্মান জানাল ! শিক্ষামন্ত্রী, জেলা শাসক, জেলাজজ এরা জনতাকে বললেন আব্দুলের মত সাহস দেখিয়ে মেয়েদের পড়ায় সাহায্য করতে, উতসাহ দিতে ! কেউ বিরোধিতা করলে পুলিশে জানালে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে বললেন পুলিশের আধিকারিক ! শিক্ষামন্ত্রী একটা বাড়তি বৃত্তি ঘোষণা করলেন মুখ্য মন্ত্রীর তরফে ! আরো দু-একজন ব্যক্তিগতভাবে কিছু পুরস্কার ঘোষণা করলেন, সব মিলিয়ে জমজমাট একটা অনুষ্ঠান ! সেসব শেষ হওয়ার পর সার্কিট হাউসে আমিনার পুরো পরিবারকে নিয়ে গিয়ে রাতের খাওয়া খাওয়ানো হল, তারপর শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গেই একটা আলাদা গাড়িতে কলকাতায় ফিরে গেল আমিনা-আবদুল-রফিক ! একটা ঘটনাবহুল দিনের সুন্দর সমাপন !

আমিনা যাদবপুরে ভর্তি হল, ইকনমিক্স আর অঙ্ক নিয়ে, অচিরেই সেখানেও মেধাবী আর ভাল স্বভাবের বলে সকলের প্রিয় হয়ে উঠল সে ! প্রফেসররাই নিজেরা উদ্যোগী হয়ে ছাত্র-ছাত্রী যোগাড় করে দিলেন তাকে, স্কলারশিপ এবং টিউশনের টাকা মিলিয়ে ভালই টাকা এখন তার অর্জন ! বিএসসি সসম্মানে পাশ করে, এমএসসিতে পড়ার সময়ও নিজের লেখাপড়ার সঙ্গে টিউশন চালিয়ে যায়, আজকাল বেশ সুনাম হয়েছে তার পড়ানোর ! স্কুলের উঁচু ক্লাসের আর স্নাতক স্তরেও ছাত্র পায় সে এখন ! তারপর একসময় সসম্মানে স্নাতকোত্তর পাশ এবং ইন্ডিয়ান স্টাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট বরানগরে চাকরী পেয়ে যায়, সঙ্গে পিএইচডি করতে থাকে, কিন্তু টিউশন চালিয়ে যায়, শনি/রবিবার আর অন্য ছুটির দিন ! তার নাকি অনেক টাকার দরকার, কেন ? কারণ সে তার মত মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিতে চায়, শুরুও করে দিয়েছে সে কাজ ! একজনের পরে আরেকজন, এভাবে যতজন মেয়েকে পারে সে সাহায্য করবে এই তার পরিকল্পনা ! নিজে উঠে আসতে পেরেছে, এখন অন্য মেয়েদের তুলে আনাটাই ব্রত তার ! লেখাপড়া শেখার এই আরেকটা ভাল দিক, সত্যিকারের শিক্ষিত যে হয়, সে অন্যদেরও তুলে আনার চেষ্টা করে, নিরক্ষরতার অন্ধকার জগত থেকে তুলে এনে আলোর জগতের ঠিকানা জানায় অন্যদেরও ! আমিনাও তাই করতে চায়, সাধ্যমত করছেও, ছেলেমানুষ মেয়ে, চারদিকে কত জিনিস, কত প্রলোভন, কিন্তু সেসবে ভোলে না সে, একটা পয়সা বাজে খরচ করে না ! যে কাজ সে হাতে নিয়েছে, তাতে যে অনেক টাকার দরকার ! একটা একটা পয়সা জমায় তার জন্য ! আর আবদুল ? তার কথা ভুললে চলবে না কিন্তু ! সেও যেন এই একই ব্রতে জড়িয়ে পড়েছে, নিজের মেয়ের পড়ার ইচ্ছাকে সমর্থন করা দিয়ে যার শুরু, আজ সেটা এইরকম সব মেয়ে যারা আর্থিক বা সামাজিক অসুবিধায় ইচ্ছা থাকলেও লেখাপড়া করে উঠতে পারে না, তাদের সাহায্য করাটাই একমাত্র লক্ষ্য তার এখন ! আমিনা ভাল চাকরী করে, টাকার যোগান অনেক বেড়েছে ! বয়স হয়েছে, তবুও রিক্সা চালায় এখনো আমাকে দুটো কারণের কথা বলে একনম্বর হল – এই রিক্সাই তাকে কলকাতায় প্রথম নিজের পায়ে, নিজের মত দাঁড়ানোর জোর যুগিয়েছে, আর দুনম্বর কারণ আমিনা যে কাজ হাতে নিয়েছে, তাতে একটুও যদি সাহায্য করতে পারে তার সামান্য রোজগার দিয়ে, সেই চেষ্টা ! 'তুমাদিগের গল্পে আচে তো দিদি কাঠ বিড়ালও রামচন্দ্রকে সেতু তৈরী করায় সাহায্য করেচিলি ! ওই যে যতটা পারে

আর কি ! আমুও সিটাই কইরতে চেষ্টা করি দিদি !' – আমি মুগ্ধ হই সাধারণ গ্রাম্য দুই বাপ-মেয়ের এই লড়াইয়ের কাহিনিতে ! পরিস্থিতি, অবস্থার বিরোধিতা সত্বেও প্রতিজ্ঞার স্থিরতার জন্য বাপকে শ্রদ্ধা করি বেশী, নিজের দেশ-গ্রাম-জমিজমা-আপনজন সকলকে হারিয়েও মেয়ের একটা ভাল কাজকে নিঃশর্ত সমর্থনের জোরটা দেখানো, এই নিরক্ষর, আপাত সাধারণ মানুষটার অসাধারণত্বে আমার মাথা আপনি শ্রদ্ধায় নত হয়ে যায় !

আমার গল্পটা আমিনার লেখাপড়ার বিষয়ে হলেও এই কাহিনী আসলে আবদুল চাচার লড়াই-এর কাহিনী ! আমার গল্পের নায়ক আবদুলচাচা, গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু সাধারণ চাষী, অবস্থা গতিকে, বাধ্য হয়ে যে শহরের রিক্সা-ওয়ালা হয়ে যায় এবং তারপরও লড়াই ছাড়ে না, বাংলার, বিশেষত মুসলমান সমাজের অসহায় মেয়েগুলোর জন্য যার লড়াই এখনো জারী, সেই মহান মানুষটিকে আমার সেলাম ! আল্লা তাকে ভাল রাখুন, শক্তি যোগান এই দোয়া করি ! আমরা শহুরে তথাকথিত শিক্ষিত মানুষ যারা চায়ের কাপে তর্ক জুড়ি, অনেক কথা বলি, কিন্তু আসলে করিনা কিছুই, তাদের সামনে আমার আবদুল চাচা এক আদর্শ চরিত্রের উদাহরণ হতে পারে !!

(সমাপ্ত)

মমতা দাস (ভট্টাচার্য) – স্বাধীনতার কিছু পরে ওপার বাংলার (তখন পাকিস্তান) সিলেট জেলায় জন্ম। তিন বছর বয়সে শিকড় উপড়ে এপার বাংলায়। জীবনের প্রয়োজনে দেশের নানাপ্রান্তে, বিদেশেও প্রবাসী জীবন। দীর্ঘপ্রবাসের পর কলকাতায় ফেরা। যৌবনের ছেড়ে যাওয়া শহরটা বদলে গেছে। মন খারাপ। তবু লিখে যাওয়া। তিনটি গদ্য গ্রন্থ প্রকাশের পর দুটি কাব্য গ্রন্থ। ইতিমধ্যে মুম্বাই, ডুয়ার্স এবং কলকাতার বিভিন্ন কাব্য সংকলনে অন্য কবিদের পাশে স্থান পাওয়া। বাংলাদেশ থেকেও সংকলনে কবিতার স্থান লাভ। সতত নিরত সাহিত্য চর্চায়। পেশা নয়, নেশা।

প্রশান্ত চ্যাটার্জী

সংরুর – পাতিয়ালা N.I.S. training – যুদ্ধ পরবর্তী প্রথম ছুটি – বাড়ির কথা

পর্ব ৮

চিরকালই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সবচেয়ে বড় বলি হন উলুখাগড়ারাই। যুদ্ধে যেমন সীমান্তের আশেপাশের বাসিন্দারা। পাশের পাড়ার ছোট্টবেলার খেলার সাথীকে রাতারাতি বিদেশী তকমা লাগিয়ে নিষেধের বেড়া দিয়ে আড়াল করে দেওয়া হয়। বা সহস্র সম্ভাবনাময় একদল যুবককে হঠাৎই মারা পড়তে হয় যারা হয়তো কেবল পরিবারকে একটু ভাল রাখবে বলে অন্য উপায় না পেয়ে সেনাবাহিনীতে কেবল চাকরি করতে এসেছিল। ১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের এই দ্বিতীয় রকম উলুখাগড়ার দলেই একজন ছিলেন প্রশান্ত চ্যাটার্জী। যিনি ভাগ্যক্রমে বেঁচে ফিরেছিলেন। তাঁর সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক প্রকাশ এই উলুখাগড়ার দিনলিপি। আজ অষ্টম পর্ব।

এখন আমাদের নতুন ঠিকানা সংরুর। সংরুর পাতিয়ালা থেকে খুব দূরে নয়। সংরুরের একটা ঘটনা মনে পড়ছে। সিক্সটিন ক্যাভেলরীতে সকলে দক্ষিণ ভারতীয় ছেলে, সকলেই দু'বেলা ভাত খেত। আমাদের মত কয়েকজন ছিল, যারা দুপুরে ভাত ও রাত্রে রুটি খেতাম। সেই সময় চাল থেকে কাঁকর বাছার জন্য ৪-৫ জন বাইরের সিভিলিয়ান বয়স্ক মহিলা আসতেন। আগামী দিনের ভাতের চাল বেছে নিজেরা খাবার নিয়ে চলে যেতেন, ওখানে বসে খেতেন না। এই ব্যবস্থাটা কে করেছিল জানিনা, যাতে ভালো ভাত পাওয়া যায় সেই জন্যই এটা করা হয়েছিল। আমাদের ওসি (অফিসার কম্যান্ডিং) সাহেব ব্যাপারটা জানতে পেরে সেই বয়স্ক ভদ্রমহিলাদের ইউনিটের ভেতরে ঢোকা বন্ধ করে দিলেন। চাল বাছা বন্ধ হয়ে গেল। ওই কাঁকর সমেত ভাতই আমাদের দেওয়া হতো। খেতে খুবই অসুবিধা হতো। দক্ষিণ ভারতীয় ছেলেরা অনেকটা বাঙ্গালীদের মতো, কথায় কথায় স্ট্রাইক, কিন্তু, কেন – এইসব প্রশ্নগুলো বেশি করত। একদিন কিছু ছেলে নিজেদের মধ্যে যুক্তি করে ঠিক করল, আজ দুপুরে কেউ আমরা মেসে খেতে যাব না। একদিন না খেলে কিছু হবে না, এটাই আমাদের প্রতিবাদ। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবো, আমরা ওই কাঁকড় সমেত ভাত আমরা খাব না। প্রতিবাদ করে না খাওয়াটা যে একটা বিরাট অপরাধ সেটা পরে জানতে পারি। সেই দিন আমরা কেউই মেসে খেলাম না। ব্যাপারটা ঠিক সময়ে ওসির কানে পৌঁছে গেল। উনি সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলেন সব ছেলেদের যারা খেতে চাইছে না, সকলকে ড্রেস পরিয়ে রোদে দাঁড় করিয়ে রাখতে। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতে – গিয়ে খেতে চায় কি না। যদি কেউ খেতে চায় তাকে মেসে পাঠিয়ে দাও, না হলে পাঞ্জাবের দুপুর রোদে দাঁড় করিয়ে রাখ। যতক্ষণ না খেতে যাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমাদের যে যে জেসিও (জুনিয়র কমিশন অফিসার) ছিলেন উনি বারবার আমাদের বোঝাচ্ছিলেন তোমরা খেয়ে নাও, নাহলে আরো বড় শাস্তি হবে। আরো বেশ কিছুক্ষণ যাবার পর আমাদের গ্যাস তখন অনেকটা কমে গেছে। কতক্ষণ আর রোদে দাঁড়িয়ে থাকা যায় ? আমরা সকলে রাজি হলাম মেসে খাবো বলে। তখন আমাদের ছেড়ে দেওয়া হলো। আমরা সকলে খাবার জন্য মেসে গেলাম। সকলে খেয়ে ব্যারাকে ফিরলাম। রাত্রে রোল কলে ওসি নিজে এসেছিলেন। রোল কলে সাধারণভাবে ওসি আসেননা। এসে প্রথমেই জানতে চাইলেন আমরা সকলে খেয়েছি কিনা। তারপর বললেন, ঘোষণা করে যদি কেউ না খায় সেটা একটা বড় অপরাধ। না জানিয়ে যদি কেউ না খায় সেটা ঠিক আছে, কিন্তু বলে না খেলে সেটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তারপর জানালেন সিভিলের মত এখানে স্ট্রাইক করা চলে না। কিন্তু, কেন – এইসব প্রশ্ন করা চলে না। কেউ বাড়াবাড়ি করলে তার লাশ কোথায় যে চলে যাবে তার বাবা-মা জানতে পারবে না। তাই ভবিষ্যতে কেউ যেন এরকম কাজ না করে। ঐদিন রোল কলে একটা হুকুম হল প্রতিদিন ১০ জন ছেলে মেসে যাবে তারা চালের কাঁকর বাছবে। অন্য কোন কাজ থাকলেও সেটা করতে হবে। নিজেদের ভালো খাবার পাবার জন্য নিজেদেরকেই এটা করতে হবে। বাইরের কোন সিভিলিয়ান মেসে ঢোকা চলবে না। সিকিউরিটির জন্য এটা মেনে নেওয়া যায়না। কত সহজে ব্যাপারটা মিটে গেল। মিলিটারিতে যতরকম অসুখ ততরকম

ওষুধ। এটাও একটা ওষুধ যেটা আমাদের সেদিন দেওয়া হয়েছিল। ওই রোদে দাঁড় করিয়ে রাখার ব্যাপারটায় সেদিন আমাদের সকলের একটা শিক্ষা হয়েছিল। আমার মিলিটারি চাকরিতে এইরকম ঘটনা আর ঘটেনি।

সংরুরে যাবার পর একটা ব্যাপারে সুবিধা হয়েছিল, আমাদের ফুটবল টিমের সকলকে পাতিয়ালায় নিয়ে গিয়ে N.I.S (ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অফ স্পোর্টস) ট্রেনিং দেওয়া হত। একেবারে ভোর বেলায় একটা ৩ টন গাড়ি আমাদের সকলকে নিয়ে পাতিয়ালায় যেত। আবার ট্রেনিং এর পর ওই গাড়িতেই সংরুর ফিরে আসতাম। বৈকালে আবার একই গাড়িতে পাতিয়ালায় যাওয়া ও ওর সঙ্গে ফিরে আসা। প্রায় চার মাস বিনা পয়সায় এনআইএসে ট্রেনিং পেয়েছিলাম। সেটা মিলিটারি টিম বলেই সম্ভব হয়েছিল। পাতিয়ালা এনআইএস ভারতের মধ্যে সবথেকে বড় স্পোর্টস ইনস্টিটিউট। পাতিয়ালার পুরনো রাজবাড়ি – সেটা এনআইএস-কে দেওয়া হয়েছিল। ওখানে সকালে যে গ্রাউন্ডে খেলা হবে সেটাতে বিকেলবেলায় হবেনা। বিকেলে ওই মাঠের মেনটেনেন্স হবে। আমরা গ্রাউন্ডে যাওয়ার সাথে সাথে দু বস্তাভর্তি বল মাঠে ফেলে দিয়ে চলে যেত। দুটো বস্তায় প্রায় কুড়িটা বল থাকত। এনআইএস-এর পর যখন ব্রিগ্রেড ডিভিশন টুর্নামেন্ট হয়েছিল, তখনও ট্রেনিং পেয়েছিলাম। ওখানে কত যে মাঠ আছে, চিন্তা করা যায় না। শুধু ফুটবল মাঠ নয়, ঐরকম হকি, বাস্কেটবল, ভলিবল মাঠ আছে। একবার মনে আছে তখন দুর্গাপূজার সময় আমাদের ফুটবল টিম – First Armed Brigade Signal Company - তে attached ছিলাম। এনআইএস-টা কাছে হত বলে। আমরা Signal company থেকে সকালবেলা দৌড়াতে দৌড়াতে এনআইএস পৌছে যেতাম, আবার হেঁটে ব্যারাকে ফিরে আসতাম। বাঙালি প্রায় সব জায়গাতে আছে, আর বাঙালি থাকা মানে সেখানে দুর্গা পূজা, গান নাটক হবেই। দুর্গামন্ডপে সমস্ত বাঙালির নিমন্ত্রণ হত এবং এনআইএসে যত বাঙালি স্পোর্টসে আসত সকলকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করা হত। এনআইএস থেকে আসার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করা হত। সেই সময় বোঝা যেত এখানে কত বাঙালি আছে। আমার ১৬ বছর প্রায় চাকরি জীবনের অনেকটা সময় ফুটবল খেলে কেটে গেছে। খেলা বাদ দিয়ে অন্য কোন কিছুই করতে হতো না।

কোন একটা টেকনিক্যাল ট্রেনিং এর জন্য পাতিয়ালা সিগন্যাল কোম্পানিতে আছি। সেই সময় পাতিয়ালায় ইলেকট্রিক অফিসে স্ট্রাইক চলছিল। সিভিল স্ট্রাইক হলেও আমাদের মিলিটারি টেলিফোন এক্সচেঞ্জেও এফেক্ট হবে। সিভিল-এর বড় এক্সচেঞ্জের সাথে আমাদের যোগ থাকে। ইলেকট্রিশিয়ানদের স্ট্রাইক এর জন্য এক্সচেঞ্জ তো বন্ধ হয়ে যাবে। এক্সচেঞ্জটা ঠিক চালু রাখার জন্য মিলিটারি থেকে টেলিফোন অপারেটর, ইলেকট্রিশিয়ান আর জেনারেটর নিয়ে ৮-১০ জনের একটা টিম ওই এক্সচেঞ্জে পাঠিয়ে দিল। আমাদের দুপুরের ও রাত্রের খাবার মেস থেকে আসতো। পাতিয়ালা এক্সচেঞ্জ থেকে আমাদের ইউনিট খুব একটা দূরে ছিল না। কয়েকদিন ওখানে কাটাতে হয়েছিল। আর একবার মনে আছে, পাতিয়ালা হাসপাতালেও কয়েকদিনের জন্য জেনারেটর নিয়ে কাজ করেছিলাম। এই সব ডিউটিগুলোতে একটু অন্যরকম গুরুত্ব অনুভব করতাম। ভালোও লাগত এই রকম ডিউটি করতে। আর একবার আমাদেরই একজনের এক ফ্যামিলি মেম্বারের একটা ডেলিভারির ব্যাপার ছিল। হঠাৎ বেলা এগারোটার সময় সার্ভিস বুক দেখে জানা কুড়ি ছেলেকে ট্রাকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গেল। দরকার পড়লে রক্ত দিতে হবে। পাতিয়ালা ছোট শহর, কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সন্ধ্যার পর আমরা ঘুরে বেড়াতাম। ট্রেনিং শেষ হলেই দু'মাসের ছুটি পাওয়া যাবে। খুব আনন্দে আছি কবে শেষ হবে ট্রেনিংটা। পাতিয়ালাতে বাঙালি ছিল। বাঙ্গালীদের "কি রে" পার্টি বলতো সবাই। কারণ একটা ব্যারাক থেকে অন্য ব্যারাকে কারো কাছে কথা বলার সময় "কি রে" কথাটা খুব ব্যবহার হত। ওই জন্য পুরো বাঙালি দের "কি রে" পার্টি বলা হত। শীতের সন্ধ্যায় খাবার সময় রুটি গুনে আনতাম না। আন্দাজ করে নিয়ে চলে আসতাম। বিশেষ করে যেদিন মাংস হতো। একটা রুম হিটার জ্বলত, আমরা গোল হয়ে বসে পড়তাম সেটার চারপাশে। রুটি গরম হতো আর খেতে থাকতাম। ১৫-১৬টা রুটি খেয়ে নিতাম।

আমাদের ট্রেনিংটা শেষ হলে একসাথে দু'মাসের ছুটি নিয়ে বাড়ি চললাম, অমৃতসর মেলে – হাওড়া। সেই সময় আসা যাওয়ার সময় রিজার্ভেশন করে আসা যাওয়া করতাম না। মিলিটারি বগিতেই আসা যাওয়া হত। গোপালনগরে পৌঁছালাম।

আমিতো খুশি, বাড়িতে বাবা মা, নেদা, ছোটদি আর অন্য সদস্যরাও খুশি। প্রথম কয়েকদিন তো হাওয়াতে ভেসে বেড়াচ্ছিলাম। দেবু, অশোক আর সকলের সাথে বৈকালে খেলা। রাত্রি আটটা পর্যন্ত স্কুল গ্রাউন্ডে বসে গল্প করা। তারপর বাড়িতে ফেরা। মাঝে মাঝে দিদিদের বাড়ি গিয়ে দেখা করে আসতাম। মেজদা, সেজদাও কোলকাতাতে থাকছিল। ওদের সাথেও দেখা করতে যেতাম। বড়দা এখনো বাড়িতে তবে আর কতদিন কে জানে!

ছুটিতে এসে সময়টা কিভাবে কেটে যায় বোঝা যায় না। বাড়িতে এলে বাবা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েন, আমাকে ভালো কিছু খাওয়াবেন। আমি চেষ্টা করি কি করে বাবাকে একটু বেশি টাকা দেবো। বাবার হাতটা সচল থাকবে। ১৯৬৬ সালে ছোটদির বিয়ে হল। ওই বছরই দেবু মারা গেল। সম্ভবত ওকে মেরে ফেলা হয়েছিল। আমার জীবনের সবথেকে ভালো বন্ধু। এই ছুটিতে মা আমাকে বললে, তোর হাতে ঘড়ি নেই, একটা ঘড়ি কিনে নে। আমি জানি ঘড়ি কিনতে গেলে বাবাকে টাকা পাঠানোর অসুবিধা হবে। কারণ সেই সময় আমার মাইনেটা এমনই ছিল, আলাদাভাবে কিছু করার উপায় ছিল না। মাকে সে কথা বলতে পারিনি। মাকে বললাম, দাদার বিয়ের কথা হচ্ছে, বিয়েতে দাদা নতুন ঘড়ি পাবে, দাদার পুরনো ঘড়িটা আমি নিয়ে নেব। এই কথাটা বলার সময় ছোড়দি সামনে ছিল এবং কথাটা দাদার কানে তুলে দেয়। দাদা বাড়ি থেকে চাকরির জায়গায় যাওয়ার সময় ছোড়দির কাছে ঘড়িটা দিয়ে যায়। আমি জানতাম না। দাদা চলে যাবার পর ছোড়দি বলল, দাদা এটা তোকে দিয়ে গেছে। দাদা বিনা ঘড়িতে চাকরিস্থলে চলে গেল। দাদার ঘড়ি আমি ব্যবহার করতে লাগলাম। সেই ঘড়ি এখনো আমার কাছে আছে। যদিও সেই ঘড়িটার মেশিন বাদ দিয়ে সবই পাল্টানো হয়ে গেছে। এখন ছুটি শেষ হয়ে আসছে। ছুটিতে খেলাধুলো আর এদিক-ওদিক ঘুরে কেটে যাচ্ছিল। ছুটি শেষ হয়ে এলে আমার যেমন মন খারাপ হয়, বাবা-মার ঠিক তেমনি মন খারাপ হয়ে যায়। ছুটিতে শুনলাম খুব শীঘ্রই দাদার বিয়ে হবে। বৌদির বাড়ি উত্তরপাড়ায় এবং বৌদির বাবা বড়দার সাথে একই অফিসে চাকরি করেন। সেই সূত্রেই যোগাযোগ।

ছুটি শেষ হল, আমি আমার চাকরি জায়গায় ফিরে গেলাম। আবার সেই পিটি, প্যারেড আর সব ওখানকার কাজ। দাদার বিয়ের তারিখ ঠিক হবার পর আমাকে জানাল। এই কদিন আগে বাড়ি গিয়েছিলাম, এখন আর ছুটি পাব না। আর দেবু মারা যাবার পর আমার সেই সময় বাড়ি যেতে ইচ্ছেও করছিল না। বাবা, মাকে, দাদাকে জানিয়ে দিলাম চেষ্টা করলাম কিন্তু ছুটি পেলাম না। যদিও কারণটা ছিল দেবুর মারা যাওয়া।

বাড়িতে থাকার সময় ভালো লাগে, আবার একটা ব্যাপারে ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায়। বাবার আর্থিক অবস্থা দেখে খুব খারাপ লাগে। অথচ দেখার পরও কিছু করতে পারছিনা ওই অসহায় অবস্থাটা খুব কষ্ট দেয়। মাকে খড় জ্বাল দিয়ে গুড় দিয়ে চা তৈরি করতে হত। বাবার অসুবিধে থাকার জন্য চিনি কিনে দিতেন না। মা গুড় দিয়ে চা খেত। পরে আমি একটা স্টোভ কিনে দিয়েছিলাম। শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে ছোটদি মাকে বলছে, মা তুমি স্টোভে চা করছ! ছোড়দিতো খড় জ্বাল দেওয়াটাই দেখতে অভ্যস্ত। মা বলে 'ঝুনি' কিনে দিয়েছে। মা আমাকে 'ঝুনি' বলত। মায়ের সে কি আনন্দ! মায়ের জন্য গায়ে মাখা সাবান আসত মেজদির কাছ থেকে। আমরা কেউ মেজদির বাড়ি গেলে মেজদি গোপনে সাবান পাঠাত। মায়ের ছয় ছেলে, সকলেই চাকরি করে। মায়ের ছেলেদের সামর্থ্য হয়না মাকে সাবান কিনে দেওয়ার। মায়ের ছেলেরা কত ভাল ছিল! আমাদের ছয় জনের কেউ মাকে পুজোর সময় একটা শাড়িও দিতাম না। আমরা সকলেই কত ভালো ছেলে ছিলাম! বাবাকে আমাদের সাধ্যমত কিছু টাকা দিতাম, কিন্তু মাকে একটা টাকা কোনদিন কেউ দেয়নি। সত্যিই আমরা কত ভালো ছেলে ছিলাম! দাদারা সকলেই মনে করত, বাবার বিশাল রোজকার। কারণ অনেক ধান জমি ছিল, রাইনে বিরাট পুকুর ছিল। কিন্তু ওই জমি থেকে কিছু পেতে গেলে বা ওই বড় পুকুর থেকে কিছু পেতে গেলে, ওই জমি বা পুকুরের জন্য কিছু খরচও করতে হত। সেই খরচের টাকাটা কোথা থেকে আসবে, সেটা কিন্তু কেউ কোনোদিন ভাবিনি। বাবা রাইনের শঙ্করদার কাছ থেকে ধারে খড় কিনতেন। মাঝে মাঝে অসুবিধা হলে নিকুঞ্জবাবুর (অমলের বাবা) কাছ থেকে টাকা ধার করতেন। সেই জিনিসটা আমরা কোনদিন খোঁজ রাখিনি, কারণ আমরা সকলেই খুব ভালো ছেলে ছিলাম। বাইরে আমাদের খুব নাম ছিল। সকলেই

বলতো "সারদা বাবুর" ছেলেদের মত ছেলে আর হয় না। এই কথা শুনে আমাদের গর্বে ছাতি বড় হয়ে যেত। বাবা ভাবতেন কার বিরুদ্ধে বলব? ওরা তো আমারই সন্তান।

একবার ছুটিতে বাড়ি গেছি, বাবা-মাকে বলছেন – "ঝন্টু এসেছে, ও তো টাকা দেবে, বৈকালের রাইন গিয়ে শংকরকে খড়ের টাকাটা দিয়ে আসব।" স্কুল মাঠে খেলতে যাওয়ার সময় দেখলাম, বাবা বাড়ি নেই। মাকে জিজ্ঞেস করতে মা বলল রাইন গেছে শংকরের বাড়ি। সাথে সাথে কারণটাও বলল। আরেকবার, ছুটি শেষ করে ইউনিটে ফিরে যাব। শুনি বাবা-মাকে বলছেন, তোমার কাছে কিছু টাকা আছে ? ছেলেটার জন্য গামছা আর মিষ্টি কিনতে হবে তো। ছুটি শেষ করে আসার সময়, প্রতিবারই একটা নতুন গামছা আর খানিকটা মাখা সন্দেশ বাবা কিনে দিতেন। সেইটা না দিতে পারার জন্য মনে কষ্ট পাচ্ছেন। আমার কাছ থেকে ১০০ টাকা নিয়ে বাবাকে দিলাম, উনি কিছুতেই ওই টাকা নেবেন না। বাবাকে আমার যে টাকা দেওয়ার কথা সেটা আগেই দিয়েছিলাম। আমার কাছে সামান্য টাকা রেখে বাবাকে দিয়ে দিয়েছিলাম। বাবা মনে করছেন রাস্তায় আমার অসুবিধা হবে। ইউনিটে পৌঁছে মাইনের টাকা না পাওয়া পর্যন্ত আমার চলবে কি করে। স্যুটকেস থেকে টাকা এনে বাবাকে দেখাতে হয়েছিল, তবে বাবা টাকা নিলেন। ঐ ১০০ টাকা নিয়ে সোজা দোকানে গিয়ে একটা গামছা আর একটু মাখা সন্দেশ নিয়ে আমাকে দিলেন। এই জিনিসগুলো আমি নিজের চোখে দেখেছিলাম, তাই আমার কষ্টটা অন্যদের থেকে অনেক বেশি হত। কারণ তারা কেউ বাড়িতে থাকত না, জানবে কি করে। চাটুজ্যে বাড়ির সব বাড়িতে ইলেকট্রিক কানেকশন ছিল, কিন্তু বাবা-মা হারিকেনের আলোয় দিন কাটাতেন। অথচ অন্য বাড়ির তুলনায় আমাদের অবস্থা ভালো ছিল, কিন্তু কয়েকজন বাড়ি থেকে চলে গেছে। ছোড়দাও এই গ্রামে অন্য জায়গায় বাড়ি কিনে বেরিয়ে গেছে। যারা এখনো বাড়িতে আছে, তারাও দু পা তুলে আছে কখন বেরোনো যায়। শুভক্ষণের অপেক্ষায় আছে। সেই জন্য তারা পয়সা খরচ করে ইলেকট্রিক কানেকশন নেওয়ার ব্যাপারে চিন্তাও করছে না। কারণ সকলেই আমরা ভালো ছেলে ছিলাম। মা একবার বলেছিল, শেষ বয়সে ছেলেদের কাছ থেকে ভালো কিছু পেলাম না।

ঠিক সময় দাদার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের সময় আমি বাড়ি যেতে পারিনি। বিয়ের পর বৌদি পড়াশোনার জন্য উত্তরপাড়াতে থাকত। তখন বি.এ. পড়ছিল। ওখান থেকে বি.এ. পাস করেছিল। তারপর কখনও গোপালনগরে, আবার কখনো পাঞ্চেত-এ থাকত। দাদা সেই সময় দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন – পাঞ্চেত-এ পোস্টিং ছিল। ওখানে দাদা একটা কোয়ার্টার নিয়ে থাকত। ওই কোয়ার্টারে আমি অনেকবার গিয়েছি। প্রতিবছর ছুটিতে এসে একবার অন্তত ওখানে যেতাম। আবার কখনো এমন হয়েছে বাড়িতে আসার সময় আসানসোলে নেমে চলে যেতাম। একবার একটা ঘটনা ঘটেছিল। ছুটিতে বাড়ি এসেছি। ওই সময়টা ইলিশ মাছ বাজারে খুব পাওয়া যাচ্ছিল। সেই সময় আমাদের বাজারে রূপনারায়ণ নদীর ইলিশ মাছ পাওয়া যেত। এখন অবশ্য আর পাওয়া যায় না। তখন চিংড়ি মাছও কম দামে পাওয়া যেত। ছুটিতে এসেছি, মাকে বললাম, মা আমি একবার দাদার ওখানে যাব। মাও খুব খুশি। মা আবার চালভাজা, কড়াই ভাজা তৈরি করল। আমি ইলিশ মাছ, চিংড়ি মাছ কিনে, চিংড়ি মাছ সেদ্ধ করে, ইলিশ মাছ ভেজে, সঙ্গে নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম দাদার ওখানে যাব বলে। বরাকর স্টেশনে নেমে ওখান থেকে ট্রেকারে যতদূর যাওয়া যায় গেলাম। তারপর হেঁটে গিয়েছিলাম অনেকটা। যাওয়ার সময় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। উনিও পাঞ্চেত-এ ডিভিসি কলোনিতে থাকেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কোথায় যাব। দাদার নাম বললাম। তখন উনি বললেন চ্যাটার্জি বাবু তো এখন নেই, বেড়াতে গেছেন। দাদার নাম এ. জে. চ্যাটার্জী। আর একজনের নামও এ. চ্যাটার্জী, তারও এক মেয়ে, এক ছেলে। সেই সময় কুমু আর রানা হয়ে গেছে। সেই ভদ্রলোক বললেন চ্যাটার্জি বাবুকে ভালো করে জানি, ওঁনার এক মেয়ে এবং এক ছেলে। এখন ওঁনারা বেড়াতে গেছেন। সেই সময় মোবাইলের ব্যাপার ছিল না, যোগাযোগের মাধ্যম একমাত্র চিঠি। দাদার সাথে চিঠিতে যা জানতাম, বেড়াতে যাবার কোন কথা আমাকে বলেনি। মনে মনে ভাবছি, হয়তো হঠাৎ ঠিক হয়েছে, চলে গেছে। তখন নানা রকম উল্টোপাল্টা ভাবছি আর হাঁটছি। মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি, যদি দাদা না থাকে, যদি বেড়াতে গিয়ে থাকে, তাহলে ব্যাগের ভেতর যা যা জিনিস আছে, সব বরাকর নদীতে ফেলে দিয়ে চলে যাব। বাড়িতে ফেরত নিয়ে যাব না। এখন মানুষের কত সুবিধা হয়েছে

যোগাযোগের। তখন চিঠিতে ৫-৭ দিন সময় লাগত যেতে। তার মানে কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেলে ১৪-১৫ দিন লেগে যেত। এইসব ভাবতে ভাবতে পাঞ্চেত কালীমন্দির পৌঁছে গেলাম। দাদার কোয়ার্টারের কাছে কালী মন্দির ছিল। ওখানে প্রণাম করে দাদার কোয়ার্টারে ভয়ে ভয়ে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়লাম। দরজায় তালা লাগানো ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। দেখলাম দরজা খুলে দিয়ে বৌদি হাসতে হাসতে ডেকে নিয়ে গেল। দাদা তখন অফিসে। দাদার সকাল থেকে বারোটা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত ডিউটি থাকত। তার পর বাড়ি ফিরে স্নান খাওয়া বিশ্রাম করে, দুটো আড়াইটে নাগাদ আবার অফিসে। বৌদিকে 'চ্যাটার্জির বেড়াতে যাওয়া'র ব্যাপারটা বলিনি। দাদা এলে পর বলব ঠিক করে রেখেছি। বৌদির ওখানে চা খেয়ে দাদার অফিসে চলে গেলাম। অফিসটা চিনতাম। এর আগেও আমি পাঞ্চেত গেছি, বেশ কয়েকবার। দাদার সাথে দেখা করতেই দাদা কার সাথে কথা বলে আমার সাথে ফিরে এল। চান করে সকলে একসাথে খেতে বসলাম। সেই সময় চ্যাটার্জিবাবুর বেড়াতে যাওয়ার গল্পটা বললাম। দাদা বললো, এখানে একজন এ. কে. চ্যাটার্জি আছে। তারও এক মেয়ে এবং এক ছেলে। সেই ভদ্রলোক সত্যি সত্যি বেড়াতে গেছে। দাদা এ. জে. চ্যাটার্জী। দাদা বৌদিকে বললাম আমি ঠিক করেছিলাম তোমরা সত্যি বেড়াতে গিয়ে থাকলে এই জিনিসগুলো সব নদীতে ফেলে দিয়ে গোপালনগরে ফিরে যাব। আমার কথা শুনে দাদা বৌদি খুব হাসতে লাগল। দু-তিন দিন ওখানে আনন্দ করে থেকে আবার বাড়ি ফিরে এলাম। দাদা-বৌদিও দু'রকম মাছ, চালভাজা, কড়াইভাজা আনন্দ করে খেল।

দাদা বৌদি স্থায়ীভাবে বাড়ি থেকে চলে গিয়ে পাঞ্চেতে থাকতে লাগল। এবার শেষ ভরসা বড়দা-বড়বৌদি। তবে কতদিনের জানা নেই। তবে আমি বুঝে গিয়েছিলাম বড়দা-বড়বৌদি বেশি দিন গোপালনগর বাড়িতে থাকবে না। সেটা বাবা-মাও বুঝে গিয়েছিল। বেশিদিন অপেক্ষা করতে হলো না। ঘটনাটা যখন ঘটেছিল আমি তখন ছুটিতে আছি। ভেতরে ভেতরে সব ঠিক করা ছিল। বড়দা একদিন বাড়ি এসে বাবাকে নোটিস দিল, আমি ছেলে মেয়েদের নিয়ে কলকাতায় বাসা নিয়ে থাকব, আগামীকাল এদের নিয়ে চলে যাব। বাবা যখন ঠাকুর দুয়ারে বসে ছিলেন। আমিও বাবার কাছেই ছিলাম। একটা কিছু ঘটতে চলেছে বুঝতে পারছিলাম। বড়দা কথাটা বলার পর বাবা হঠাৎ সোজা হয়ে বসে শুধু বললেন, "তাহলে আমাদের কি হবে ? আমাদের কে দেখবে ?" বড় বৌদি বাবার কাছে এসে জানাল, "চিরকাল বাড়িঘর দেখলে চলবে না, ছেলেদের মানুষ করতে হবে।" মনে হচ্ছিল গোপালনগরে অন্য বাড়ির ছেলেরা বোধহয় মানুষ হবে না। বাবা-মা একেবারে চুপ হয়ে গেল। মা চোখে ভাল দেখতে পায় না। ওদের কথা চিন্তা করে আমি দিশাহারা হয়ে গেলাম। আমার নিজের কিছু করার নেই, কারণ আমি মিলিটারিতে চাকরি করে যা পাই তাতে বিয়ে করা মোটেই সম্ভব নয়। বাবা-মায়ের ছয় ছেলে, পাঁচ বউমা, সেখানে বাইরে থেকে রান্নার জন্য লোক ব্যবস্থা করা হল। বাবা মা বাইরের রাঁধুনির হাতে রান্না করা খাবার খাবে, বাবা-মায়ের কি ভাগ্য। আমরা তো সকলেই খুব ভালো ছেলে। হঠাৎ করে নেদার বিয়ের ব্যবস্থা হল, খুব তাড়াতাড়ি নেদার বিয়ে হয়ে গেল। আমি মনে মনে খুব খুশি হলাম, ভেবে দেখলাম নেদা তো কলকাতায় কোন কাজ করে না, সে অন্তত বউ নিয়ে বাবা-মাকে ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারবেনা। বেহালায় নেদার বিয়ে হয়েছিল, বেলা তার মামার কাছে মানুষ হয়েছে। নেদাও মামাবাড়িতে মানুষ। নেদা ততদিনে ছোড়দার কাছে কম্পাউন্ডারী শিখেছিল। বেলা এসে মা বাবার দায়িত্ব নিল, বাবা মাকে খুব যত্ন করত। এটা দেখে মনে কিছুটা শান্তি নিয়ে ইউনিটে ফিরে এলাম। বাবার সব ছেলে বউ বাইরে, নাতবৌ এখন সংসারের দায়িত্বে।

(চলবে)

Prasanta Chatterjee — 76 years. Retired from Indian army on 1978. Later worked at Indian postal service. Retired on 2001. Passionate footballer. Played for Indian army team. Stays at Gopalnagar, Kolaghat, East Midnapore, West Bengal, India.

মুক্তগদ্য সিরিজ 'তেরো অপয়া নয়'

পারিজাত ব্যানার্জী

সাত সুরের "প্র"-লয়

পর্ব ৭, ৮ ও ৯

(পর্ব ৭)

সুরের জগতে আমি নেহাতই বড় বেমানান মা। তাল, লয়, সরগম ঠিকমত এর কোনোটাই যে ধরা দেয়না আমার কাছে সেটা কিছুতেই বুঝতে চাও না তুমি। ছন্দে ছন্দে দু এক কলি মাঝে মাঝে যে বয়ে যায়না আমারও চিত্তস্থল থেকে, তা ঠিক নয়। তবু, কে জানে কেন, মাঝে মাঝে সাতসুরের ঝংকারেও কেমন যেন হকচকিয়ে যাই। মনে হয়, থামুক এ বীণা ! অনেক তো হল এবার !

আসলে, সুর ঠিক কাকে বলে মা ? এই যে রোজকার স্বাভাবিক এক ছন্দে চলতে থাকে প্রাত্যহিকতা, একে অপরের কথার বোলে লাগে মূর্চ্ছনা, নিশ্চিন্ত ঢিমে লয়ে চলতে থাকে জীবন থেকে মৃত্যু হয়ে আবার নতুন জীবন, এর নামই তো সুর ! তাই না ? অথচ দেখো, তোমার কাছে এত বছর তালিম নিলাম, তবু সরগমের মাধুর্যটুকুও ফুটলনা আমার স্বরে ! তোমার যেই মুড়কিগুলো উঠে আসে অন্তঃস্থল থেকে, তাই কেবল দলা পাকিয়ে যায় এসে আমার কণ্ঠনালিতে। এটাই হয়তো স্বাভাবিক। আমি যে তোমার বাধ্য ছাত্রী কোনোদিন ছিলাম না মা !

তাই তুমি যখন চোখ বুঁজে তানপুরায় একটা একটা করে বোল তুলতে, আমি তখন তাকিয়ে থাকতাম জানালার ফাঁকফোকর দিয়ে বাইরে। জানো ওই খোলা আকাশের দিকে যখন তাকাতাম অপার বিস্ময়ে, দেখতে পেতাম, তোমার সৃষ্ট সাত সুর কেমন একটা একটা করে সময় নিয়ে রামধনুর প্রতিটি রঙে গিয়ে মিশে যাচ্ছে অবলীলায় ! বেগুনি রঙ যেমন উস্কে দিচ্ছে সৃজনশীল "সা", নীল রঙের তেমনই উপচে পরছে রেশমী "রে", আকাশি রঙে মাতোয়ারা গনগনে "গা", সবজে আভায় বিকেলবেলার মাধুকরী "মা", হলুদবরর্ণে উজ্জ্বল পূজনীয় "পা", কমলার আলতো লাজে রাঙা ধরণীগর্ভা "ধা", আবার লাল রঙে বরাবরই যৌবনোচ্ছল নিষিদ্ধ হাতছানি "নি"র !

মনে আছে, একটা একটা করে রঙ ধরত অম্বরে সেই সময়। আবার তা মিলিয়ে যেত অন্যের দ্যোতনায়। আবার সব রঙ মিলে সৃষ্টি করত নতুন অন্য সুর ! বিস্ময়ে বলব না বিমুগ্ধতায় জানি না, সেই সাতরঙে গোলা সাত সুরের সাথে যখন দুধসাদা মিলে একাকার হয়ে গেছে, তখনই লোপ পেয়েছে আমার চেতনা।

হ্যাঁ মা, সুর আছে। সরগমের পরেও সুর থাকে ! সে তান রামধনু শেখায়না আমাদের – তাই লজের বেসুরো প্রলয়নিনাদে কেঁপে উঠি খালি খালি ! সব সময় !

গান শেষে তুমি যখন চোখ মেলে চাইতে অবশেষে, আমি ফিরে পেতাম আমার সম্বিত। জানো তখন কি দেখতে পেতাম আমি ? তোমার চোখের ভেজা কোণে ঝিলিক দিয়ে ওঠা মন কেমনের এক অসামান্য অদ্বিতীয় সুর !

জানতেনা তো ! কোনও জাতশিল্পীই বুঝতে পারে না শুনেছি ও সময়। শুধুমাত্র এই আমার মতো কিছু "ভুলে ভরা"র দল যখনই টের পেয়ে যায় ওই সাত সুরের অমিল, তখন এতকিছুর মাঝেও তাদেরই. শুধু আর শেখা হয়না প্রাথমিক সাত সুরও!

(পর্ব ৮)

অষ্টম বিপত্তি

তুমি তো এসব কোনোদিন মানতে না, তাই না মা ? এসব বলতে ওই আর কি – "শনিঠাকুরের পুজো" বলতে নেই বাদবাকি পুজোর মতো, বলতে হয় "বারের ব্রত", তাঁর প্রসাদ বাড়ি বয়ে আনতে নেই, ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে খেতে হয়, শনিদেবতার চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু চাইতে নেই – ইত্যাদি ইত্যাদি ? আচ্ছা মা, তুমি জানতে শনিদেবের নম্বর হল 'আট'? আট তাই কারও শুভ সংখ্যা হতে পারে না কখনও? যারা আটে জন্মায় তাদের জীবনে নেমে আসে সব ধরণের বাধা, বিপত্তি – এইসব ? আমি জানি, তুমি জানতে না। বা জানলেও নিজের সমস্ত জীবন জুড়ে কখনও অন্তত মানার প্রয়োজন বোধ করোনি ওসবে। ভাগ্যিস!

মনে আছে, তুমি যখন আমায় ছোটবেলায় শনিদেবতার গল্প শোনাতে, কোনটা বলোতো, আরে ওই গণেশঠাকুরের মাথা কেটে যাওয়াটা – আমার না তখন থেকেই ওনার জন্য ভারী মায়া হত। সত্যি করে বলো তো, তাঁর কি অপরাধ ছিল ওই পুরো অধ্যায় ? তিনি তো শুধুই হয়েছিলেন এক ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার। গল্পে যতটা অসহায় ছিলেন গণেশ, তাঁর থেকেও বেশি বেদনায় প্লাবিত হয়েছিল তাঁর হৃদয়। প্রত্যেক মামার মতোই তিনিও তাঁর ভাগ্নেকে আশীর্বাদ দিতেই তো গিয়েছিলেন শুধু, তাই না ? মা দুর্গাও তো জানতেন বলো এই সাক্ষাতের ফল ? তবে তিনি কেন জোর করে ডেকে আনলেন তাঁর ভাইকে ? যার সাথে চোখাচুখি হতেই ভস্ম হয়ে গেল গণেশের মুণ্ড !

আর সমস্ত দোষের একা ভাগীদার হলেন অভিশাপে ইতিমধ্যেই জর্জরিত, দগ্ধ এক দেবতা !

আসলে কি জানো মা, কোনোকিছু হওয়ার থাকলে তাকে আটকানো যায়না কোনোভাবেই। সে ঝড়ই বলো বা ভূমিকম্প। স্বয়ং দেবতাদের হাতেও নেই নিয়তির থেকে বাঁচবার রক্ষাকবচ। তবু যা হয়, অন্যকে দোষ দিতে পারলেই যেন নিজের ঘাড় থেকে লাঘব হয়ে যায় কিছুটা বোঝা – এই আর কি! তো বিধির লিখনে কে হবে সেই 'নন্দ ঘোষ'? কেন, শনিদেব আছেন তো – ব্যাপারখানা এমনই !

অন্য গ্রহদের থেকে তাঁকে দেখতে আলাদা – একমাত্র তাঁর পাশেই গোলাকারে ঘুরছে অসামান্য এক বলয় – নিশ্চয়ই কোনো অশুভ অভিসন্ধি কাজ করছে এর পিছনে ! দেবতা হলেও দাও দেখি তাঁকে একঘরে করে – তিনি যে আর বাকিদের মতো সাধারণ নন কিনা ! ঠিক যেমন করে আলাদা করে দেওয়া হয়ে অটিস্টিক বাচ্চাদের,বা অন্য চোখে দেখা হয় শারীরিক পঙ্গুত্বকে – ব্যাপারটা অনেকটা সেরকমই ! ভাবো না, দেবতা অথচ তাঁর প্রসাদ খেতে হবে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে – এও কি তাঁকে অসম্মান করা নয় ! বলোতো, এতো করেও কি সত্যিই ভালো থাকছে সবাই ? অন্যের কাঁধে দায় চাপিয়েই কি নিজে বাঁচা যায় ?

সেই তাঁর সংখ্যা যখন আট, তবে তো "ওরে বাবারে ! সাবধান !" কিন্তু কখনও খেয়াল করেছো মা, ইংরেজিতে এই আট সংখ্যা থেকেই আবার সব সংখ্যা হয়েছে প্রসারিত ! বিশেষ করে আমাদের আগামী যেই ডিজিটালের হাত ধরে এগোচ্ছে, সেই ডিজিটাল হরফে লেখা আট-ই কিন্তু সব সংখ্যার জনক ! তার এদিক ওদিক থেকে হাত পা কেটেই প্রতিনিয়ত তৈরি হয় অন্যান্য সংখ্যারা ! ঠিক যেমন সব অপমান একা সহ্য করে অন্ধকারেই বিলীন হন নিঃসঙ্গ শনিদেব !

কেন জানো ? কারণ তিনি জানেন যাবতীয় কষ্ট আঘাত সহ্য করতে করতেই একদিন প্রস্ফুটিত হবে তাঁরও সুপ্ত ঐশ্বরিক দীপ্তি ! বিশ্বাস করেন, পালটাবে সময়।

ততদিন হোক না আর একটু সবুর। তুমি শুধু দেখো যেন অন্য ধর্মভীরুদের মতো এ নিয়ে বেশি মাথা ঘামিয়ে ফেলো না আর, কেমন ?

(পর্ব ৯)

নবরত্ন বাহার

আমি কি ঠিক সত্যিকারের মেয়ে নই মা ? কে জানে ? আমার কিন্তু জানো বেশ ভালো মতোই সন্দেহ হয় আজকাল, বিশেষ করে যখন আশপাশের চোখ বুলিয়ে আড়চোখে দেখে নিই কখনো বাকি সব তনয়াদের। ইশ, তাদের কি রূপ গুণ বলো তো! একেবারে যা তা !

এই যেমন ধরো না, মেয়েদের নাকি এই পছন্দ, ওই পছন্দ, তারা সাজতে ভালোবাসে,লোকেদের চোখে কাঙ্খিত হতে মন চায় তাদের – কই, তেমন তো কিছু ঠিক মনে হয়না আমার ? এই যে গেল সপ্তাহে গয়নার দোকানে গিয়ে কত কিছুই না চেনালে তুমি – এটা মান্তাশা, ওটা সিংহমুখী, সেটা সিতাহার – কই, তবুও তো কিছু তেমন মনে ধরল না আমার ! সামান্য শাড়ি, জামা,বা ফাটা জিন্স, লিটল ব্ল্যাক ড্রেসের ফারাক করতে পারলাম না একটুও আজও, তার উপর আবার গয়না ! যা হোক একটা কিছু হলেই তো হয়ে গেল; তাই তো দেখে বুঝে এসেছি আজীবন ! তোমার ওই আজন্মকাল চলতে থাকা টেলি ধারাবাহিকেও তো দেখি, সোনাদানা, গয়নাগাটি,সাজগোজ নিয়েও এক্কেবারে চুলোচুলি বেঁধে যায় পরিবারের সকলের মধ্যে। অথচ, আমার দেখো – সেসবের কোনো বালাই-ই নেই যেন ! ধুস ! এরপরেও সন্দেহ হবে না বলো ?

হ্যাঁ, তবে তোমার ওই চুনির পাথরটার উপর কিন্তু বেশ লোভ রয়েছে আমার ! ওই যে যেটা তুমি গলায় পরে থাকো সবসময় ! জ্বলজ্বল করে ওঠে যার রোশনাই রাতের অন্ধকারের মাঝেও – হ্যাঁ গো, সেটার কথাই বলছি। কেমন যেন কালচে লাল দ্যুতিময় ওটা তাই না, এক্কেবারে প্রাণোবন্ত! বা ধরো, অতটা দামী কিছুরও দরকার নেই, ওই গড়িয়াহাটের মোড়ের দোকানের ঝুটো রঙিন পাথর – ওসব হলেও চলবে ! এত বয়সেও মনে হয়, দেখলেই কিনে নিই সব একসাথে। আমার তো বিয়ের সময়েও ওসব পাথর টাথরেই বেশি আগ্রহ বরাবর – ওই, কি যেন বলো তোমরা – নবরত্ন না কি ? ওরকম হলেই চলবে ! অবশ্য, এমনভাবে বললাম কথাটা যেন, তুল্যমূল্যর চটকে তারা নেহাতই বেমানান, হীন ! অনেক বেশি দাম নাগো তোমার চুনীর মতো ওইসব পাথরের – আর কি কি যেন হয় – পান্না, নীলা, পোখরাজ, ওপাল ? নাঃ, তাহলে আর ওসবেও কাজ নেই আমার বরং !

আমি তার চেয়ে দাম দিয়ে আয়োজন করব কখনও এক নবরত্ন সভার, যেখানে উপস্থিত প্রতিটি দিকপালের শিক্ষা এবং সাধনায় সমৃদ্ধ করতে পারব নিজের অন্তর। ভেবে দেখলাম, যত দাম দিয়ে বাইরের অলঙ্কার কিনে লাভ হচ্ছে আমার, তার চেয়ে ভিতরকার মানুষটার উজ্জীবন ও শুদ্ধিকরণ অনেক বেশি মনোরম, চিরস্থায়ী। ভাবো তো, আদৌ সুখ ছিল কি আর রাজা বাদশাহেদের অন্তরমহলে ? যুদ্ধ, কূটনীতি, রাজনীতি কৌশলসাধনা আর পরাক্রমেই তো কেটে যেত তাঁদের অর্ধেক জীবন ! তারপরেও যেটুকু বেঁচে থাকা যায়, তাকে সমৃদ্ধ করতেই তো গড়ে তুলতেন তাঁরা এই নবরত্ন সভা। একে তুমি বিনোদনই বলো বা জ্ঞান আহরণ বা, নিতান্তই শিল্পচর্চা – তবে আমি বলব, এ হল গিয়ে একান্ত বেঁচে থাকার রসদ। গয়নাগাটির চকমকে আর সে জেল্লা কোথায় ?

তো যা বলছিলাম, আমি যদি নবরত্ন সভার আয়োজন করি কোনোদিন, জানো, ঠিক কি কি থাকবে তাতে ? কে কে থাকবেন সেই আয়োজন আলো করে, তা এখনো ঠিক করে উঠতে পারিনি প্রতিভাদের সহজলভ্যতায়, তবে কোন কোন বিষয়কে গুরুত্ব দেবো, সেটা, ইতিমধ্যেই, বেশ ছকে ফেলেছি কিন্তু আমি। একজন সাহিত্যিক অবশ্যই থাকবেন সেই সভার শীর্ষস্থানে, যাঁর কাজই হবে প্রতিনিয়ত কেবল রচনা করে চলা। কি জানো তো, অন্যদের তবু একটা আধার থাকে, যাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠতে পারে তাঁদের শিল্প। কিন্তু সাহিত্যিকের এক কল্পনাপ্রবণ মন ছাড়া আর কিই বা আছে বলো ? তাতে ভর করেই তো তাঁরা শূন্য থেকে শুরু করেছেন সব ! তার বদলে এটুকু সম্মাননা দেবোনা তাঁদের,বলো?

যাই হোক, এরপর আসি বরং এক এক করে বাদ বাকি গুণীজনায়।

– চিত্রকর, যাঁর এক একটা ছোঁয়ায় প্রাণ পাবে কয়েকখানি রেখা !

– সুর সাধনায় এক নিবেদিত প্রাণ যিনি তাল লয়ের সংমিশ্রণে জাগিয়ে তুলবেন নতুন মূর্চ্ছনা !

– মৃৎশিল্পী যাঁর হাতের খোদাইয়ে রূপ পাবে অতিব সাধারণ মাটি !

– আলোকচিত্রকর যাঁর দৃষ্টিতে ধরা পরা সমস্ত সুন্দর মুহূর্ত পলকে বন্দী হবে ক্যামেরায় !

– দার্শনিক যিনি প্রতিনিয়ত হেরে যাওয়া সব মানুষগুলোকে বাঁচতে শেখাবেন আবার নির্দ্বিধায় !

– একজন খেলোয়াড় যিনি প্রতিনিয়ত মেনে নেন নির্বিঘ্নে জীবনের সব হার জিতকে!

– একজন মহাকাশচারী যিনি দেশকালের সব ছোট ছোট সীমানার উর্দ্ধে উঠে পাড়ি দেন অনন্ত নক্ষত্ররাজির মধ্যে!

আর ? আর বেছে নেব আগেরকার দিনের মতোই এক হাস্যরসে নিবেদিত প্রাণকে যাঁর নির্ভেজাল তামাসায় হৃদযন্ত্রটি থাকবে এক্কেবারে সুস্থ,তরতাজা, প্রাণোবন্ত, সব সময় !

জানাবো মা ! আগে সব গুছিয়ে গাছিয়ে নিই ক্ষাণিক এদিকটায়, কেমন ! গয়নার দোকানের কাঁচ আর আলোর মেকি প্রদর্শনে ঠিকরে ওঠা দ্যুতিতে হয়তো সে ভাসবে না, তবে, আমার নবরত্নের বাহারের স্পর্ধার বিচ্ছুরণের জ্বলে উঠবেই সে এক নব্য-সনাতনী প্রাণ মন্দির !

পারিজাত ব্যানার্জী – জন্ম ধানবাদে হলেও লেখিকার আদ্যপ্রান্ত বেড়ে ওঠা কলকাতায়। বিবিএ, এমবিএ পাশ করে টানা আট বছর কলকাতায় রিয়াল এস্টেটে চাকরি করলেও বরাবরই লেখালেখিতেই তাঁর প্রধান ঝোঁক। ইতিমধ্যেই কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছে ছোটগল্প, উপন্যাস এবং কবিতা সংকলন মিলিয়ে তাঁর পাঁচ পাঁচটি বই। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আরও বেশ কিছু লেখা। প্রথম পুরস্কার পেয়ে সম্মানিত হয়েছেন অধ্যাপক কবি আব্দুর রসিদ চৌধুরীর স্মরণ প্রতিযোগিতায়। বর্তমানে স্বামী সুমিতাভ'র সাথে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে বাস করছেন কর্মসূত্রে।

বাতায়ন

BALCONY

The English publication from Batayan group
April 2021

বাতায়নের নতুন প্রকাশনা

এক বাক্স চকলেট

সুজয় দত্ত বর্তমানে আমেরিকার ওহায়ো রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানতত্ত্বের (statistics) অধ্যাপক। জৈবপরিসংখ্যান বিশ্লেষণতত্ত্ব (biostatistics) তাঁর গবেষণার বিষয়। তিনি কলকাতার বরানগরের ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্র। কিন্তু তরুণ বয়স থেকেই সাহিত্য তাঁর সৃজনশীলতার মূল প্রকাশমাধ্যম, সাহিত্য তাঁর মনের আরাম। ছোটগল্প, বড় গল্প, প্রবন্ধ ও রম্যরচনার পাশাপাশি নিয়মিত কবিতাও লেখেন। এছাড়া করেছেন বহু অনুবাদ – হিন্দি থেকে বাংলায় এবং বাংলা থেকে ইংরেজিতে। গত পনেরো বছরে আমেরিকার বেশ কয়েকটি সাহিত্য-পত্রিকায় ও পূজাসংখ্যায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি দীর্ঘদিন হিউস্টনের "প্রবাস বন্ধু" ও সিনসিনাটির "দুকুল" পত্রিকার সম্পাদনা ও সহসম্পাদনার কাজও করেছেন। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার "বাতায়ন" পত্রিকাটির জন্মলগ্ন থেকে সেটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছেন। এই তিনটি পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলি ছাড়াও "অপার বাংলা" ও "গল্পপাঠ" নামক ওয়েব-ম্যাগাজিন দুটিতে, নিউজার্সির "আনন্দলিপি" নামক পত্রিকাটিতে, ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত পূজাসংকলন "মা তোর মুখের বাণী"তে আর ভারতের মুম্বাই থেকে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ "কবিতা পরবাসে" রয়েছে তাঁর লেখা। সম্প্রতি নিউ জার্সির "আনন্দ মন্দির" তাঁকে "গায়ত্রী গামার্স স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কারে" সম্মানিত করেছে। সাহিত্যরচনা ছাড়া অন্যান্য নেশা বই পড়া, দেশবিদেশের যন্ত্রসঙ্গীত শোনা ও কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র বাজানো।

"সুজয়ের গল্প পাঠে উপভোগ্য। শব্দে ও কথায় এই বুনোট তৈরী করা মুখের কথা নয়। এখানেই গল্পকারের সিদ্ধি।"

"আঙ্গিকের কেরামতি দিয়ে গল্পকে সিউডো-আধুনিক কিংবা দুষ্পাঠ্য করেননি সুজয়। অনাড়ম্বর কথাশৈলী, পরিমিতিবোধ, বিষয়ের বিন্যাস, এবং বর্ণনা ও গতির মাত্রাবোধ বুঝিয়ে দেয় তিনি লেখায় অতি যত্নবান।"

"সুজয়ের যেকোনো লেখা পড়তে পড়তে একটা কথা মনের ভিতর থেকে উঠে আসে। মনে হয় লেখায় কোনো চাতুর্য্য নেই। জোর করে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করার প্রয়াস নেই। তাঁর লেখার আন্তরিক ভঙ্গী মন ছুঁয়ে যায়।"

– রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

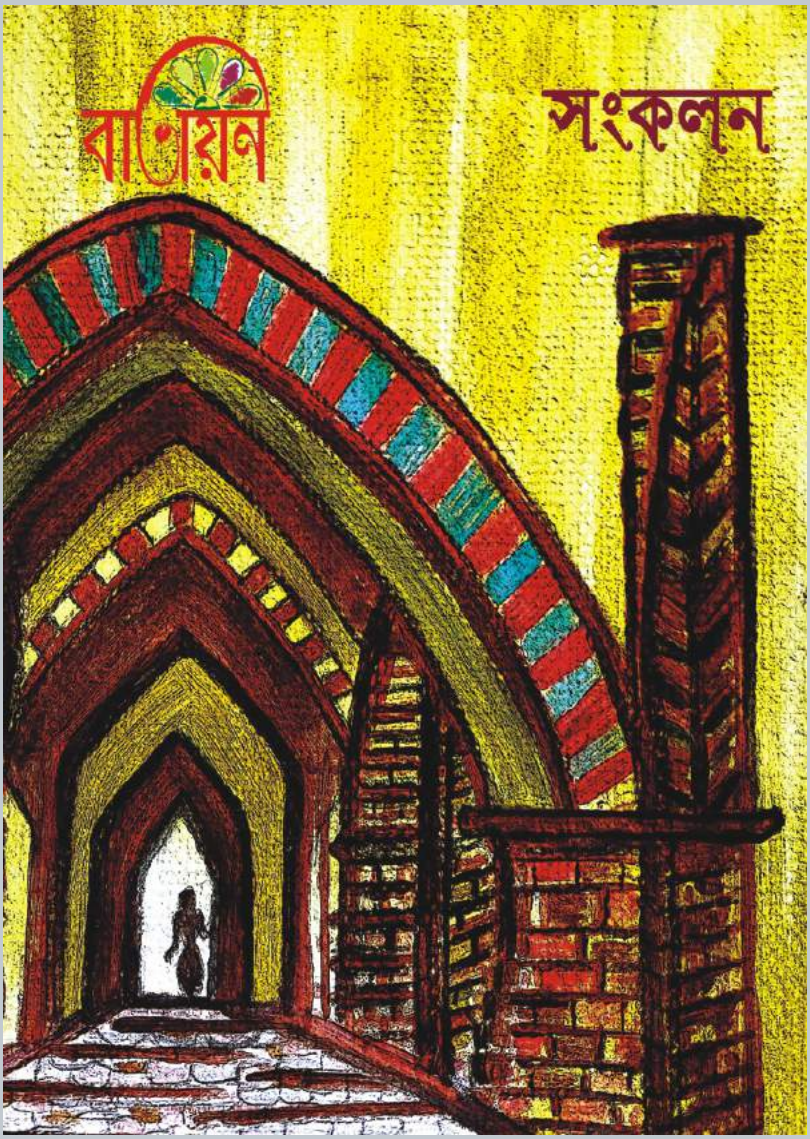

"প্রবাসীদের বাংলা-চর্চাকে বরং আরও কিছুটা নিবিড়ভাবে বোঝার চেষ্টা করতে হবে হয়তো কেবল এই কারণেই যে, তাঁরা এই চর্চার পথে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন, প্রতিনিয়ত। ফলে ভাষা-সংক্রান্ত যে-কোনও একটি কাজ আমরা যতটা অনায়াসে সংঘটিত করে ফেলতে পারি, দেশ থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে সম্পূর্ণ অন্য আবহাওয়া ও সংস্কৃতির বাসিন্দা হয়ে তাঁরা সেটি তত অনায়াসে পারেন না।

বাতায়ন-ও তেমনই একটি প্রয়াস, প্রবাসে বাংলা সাহিত্যচর্চায় যাকে এখন অগ্রগণ্য বললে ভুল হয় না। অনেকদিন ধরে, অনেক কাঠিন্যের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এই কাগজ আজ যেভাবে বিস্তীর্ণ পাঠককুলের কাছ থেকে মর্যাদা আদায় করে নিতে পারছে, তাতে বাংলা ভাষার একজন সামান্য কর্মী হিসেবে আমারও গর্ব হয় বৈকি। আমরা এখন কথায় কথায় বলি বটে, বিশ্বায়নের এই যুগে দেশ বলে আর নেই কিছু, কিন্তু আমি নিজে অকিঞ্চিৎকর ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, আজও দেশের মাটি থেকে দূরে বসবাস করে নিজের ভাষায় একটি যথাযথ মানের পত্রিকা বার করতে কতখানি ক্লেশ পোহাতে হয়। বাতায়ন বহুদিন যাবত সেই ক্লেশের আগুন পার করে এসে এখন পাঠকমহলে উজ্জ্বল।"

শ্রীজাত

"বাতায়ন", ভালবাসা, ভুবনায়ন

বেশ বুঝতে পারছি আজকের ডিজিটাল দুনিয়াতেও মুদ্রিত একটি বই হাতে ধরার আনন্দ ম্লান হয়ে যায় নি। এই অতিমারীর দিনে এটাই আশার কথা। গল্প, কবিতা, নাটক আর প্রবন্ধে বেঁধে বেঁধে থাকা – এসবের মধ্যে দিয়েই তো দূর হয়ে ওঠে নিকট বন্ধু আর পর হয়ে ওঠে ভাই। পাঠকদের মনে বাতায়নের জন্য এই ভালবাসার আসনটি পাতা যাতে পাতা থাকে সে চেষ্টা করে যাব আগামী দিনগুলোতে। ভবিষ্যতের চেহারা কেমন তা সবসময়ই আঁকা কঠিন। আজকের পরিস্থিতে হয়তো দুরূহ। কিন্তু আলোকশিখার মতো একটি ভাবনা হৃদয়ে জ্বালিয়ে রাখি।

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক, "বাতায়ন" পত্রিকা গোষ্ঠী